www.banglabook.com

শীত ও অন্যান্য গল্প

shaibalrony@yahoo.com

শীত ও অন্যান্য গল্প

হুমায়ূন আহমেদ

****
****
****

www.banglabook.com

দিনরাত্রি প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশক
আহসান হাবীব
দিনরাত্রি প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনা পরিচালক :
সাদ ইকবাল শাহরিয়ার

প্রথম প্রকাশ
আগস্ট ১৯৮৬
দ্বিতীয় প্রকাশ
আগস্ট ১৯৮৮

প্রচ্ছদ
আহসান হাবীব

মুদ্রক
মোহাম্মদ মোস্‌লেম খান
দি ক্রাউন প্রেস
২ শ্রীশ দাস লেন, ঢাকা-১

পরিবেশক
স্টুডেন্ট ওয়েজ
বিদ্যাপ্রকাশ
নসাস
আনন্দ প্রকাশন

মূল্য : ত্রিশ টাকা

উৎসর্গ

প্রণব কান্তি বোস
শ্রদ্ধাস্পদেষু

www.banglabook.com

দিনরাত্রির অন্যান্য বই
আকাশ বাড়িয়ে দাও : মুহম্মদ জাফর ইকবাল
নৃপতি : হুমায়ূন আহমেদ
গল্প কথার ছন্দ : শামসুন্নাহার
বাটিক শেখা : মমতাজ শহীদ
সম্রাট : হুমায়ূন আহমেদ
এলেবেলে : হুমায়ূন আহমেদ
ট্রাইটন একটি গ্রহের নাম : মুহম্মদ জাফর ইকবাল

shaibalrony@yahoo.com

সূচীপত্র

সাদা গাড়ী ৯
গোপন কথা ১৯
একজন সুখী মানুষ ... ২৬
জলিল সাহেবের পিটিশন ... ৩৫
শীত ৪৬
সুখ অসুখ ৫৫
রহস্য ৬৪
অপরাহ্ণ ৭০

সাদা গাড়ী

আমি যাদের পছন্দ করি না তাদের সঙ্গেই আমার ঘুরে ফিরে দেখা হয়। হয়ত খুব জমিয়ে গল্প করছি, কাজের ছেলেটি এসে বললো, 'কে জানি আইছে আপনারে বুলায়।' বাইরে উঁকি দিলে এমন একজনকে দেখা যাবে যার সঙ্গে এক সময় খাতির ছিল। এখন নেই। তবু হাসির একটা ভাব করে উল্লাসের সঙ্গে বলতে হবে, 'আরে, আরে কি খবর? তার পর কেমন চলছে?' এক সময় হয়তো এই লোকটির সঙ্গে তুই তুকারি করতাম এখন দূরত্ব রাখার জন্যে ভাব বাচ্যে কথা বলতে হয়। বাংলা ভাষার ভাব বাচ্য খুব উন্নত নয়। দীর্ঘসময় কথা চালানো যায় না।

আজকের ব্যাপারটাই ধরা যাক। আড্ডা খুব জমে উঠেছে। বাংলা বানান নিয়ে খুব তর্ক বেঁধে গেছে। এমন সময় কাজের ছেলেটি এসে বললো আমাকে কে নাকি ডাকছে। বেরিয়ে দেখি সাব্বির। আমি হাসি মুখেই বললাম, 'বাইরে কেন, ভেতরে এসে বসুন।' সে অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে হাসলো।

ঃ আসুন ভেতরে।

ঃ না না ঠিক আছে।

ঃ আমার কয়েকজন বন্ধু-বান্ধুব এসেছে গল্প-গুজব হচ্ছে। আসুন পরিচয় করিয়ে দেই।

ঃ অন্য আরেক দিন আসব।

ঃ আজ অসুবিধা কিসের? আসুন ভিতরে।

সাব্বির চোখ মুখ লাল করে ভেতরে ঢুকলো। পুরুষ মানুষদের লজ্জায় এমন লাল হতে কখনো দেখিনি। নাকের পাতায় বিন্দু বিন্দু ঘাম।

ভেতরে তখন তুমুল উত্তেজনা। আজিজ, ফজলুকে জিজ্ঞেস করছে, 'ধুলি বানান কর দেখি ? হ্রস্বউকার না দীর্ঘউকার ?' রাগের চোটে ফজলু তোতলাচ্ছে। ক্রমাগত তার মুখ দিয়ে থুথু পড়ছে। বিশ্রী অবস্থা।

সাব্বির নার্ভাস ভঙ্গিতে রুমাল দিয়ে তার মুখ মুছলো এবং মৃদু স্বরে বললো, 'আজ যাই অন্য আরেক দিন আসব ?'

ঃ বসুন না। তাশ হবে। তাশ খেলতে পারেন তো ?

ঃ ঝি না। আজ আমি যাই। আজ আমার একটা কাজ আছে ?

আমি সাব্বিরকে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গেলাম। সেখানে সাদা রঙের প্রকাণ্ড একটা গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। মুসকো জোয়ান এক ড্রাইভার যে সাব্বিরকে দেখে স্প্রিংয়ের মত লাফিয়ে বের হলো এবং দ্রুত দরজা খুলে মূর্তির মত হয়ে গেলো। আমাদের বয়সী একটা ছেলের জন্যে এতটা আয়োজন আছে ভাবাই যায় না। আমি তীব্র একটা ঈর্ষা নিয়ে মোড়ের দোকান থেকে সিগারেট কিনলাম। ছুটির সকালে ঈর্ষার মত জিনিস দীর্ঘস্থায়ী হয় না। কিন্তু এটা অনেকক্ষণ ধরে বুকে খচ খচ করতে লাগলো।

সাব্বিরের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রটা এ রকম—পুরনো পল্টনের এক ওষুধের দোকানে ঢুকেছি প্যারাসিটামল কিনতে। পয়সা দিয়ে বেরুবার সময় দেখলাম ঘটাঘট শব্দে সব দোকানের ঝাপ পড়ে যাচ্ছে। চারদিকে দারুণ ব্যস্ততা। কি হয়েছে কেউ কিছু বলতে পারছে না। সবাই ছুটছে। ট্রাকওয়ালাদের সঙ্গে বাসওয়ালাদের কি নাকি একটা ঝামেলা! একদল লোক নাকি রাম দা নিয়ে বের হয়েছে। ব্যাপারটা গুজব হবারই কথা। এ যুগে রাম দা নিয়ে কেউ বের হয় না। তবু সাবধানের মার নেই দ্রুত পাশের গলিতে ঢুকে দেখি গলির মাথায় একটা দারুণ ফর্সা পাঞ্জাবী গায়ে ছেলে লম্বা-লম্বি হয়ে পড়ে আছে। তার চশমা ছিটকে পড়েছে অনেকটা দূরে। আমি গিয়ে তাকে টেনে তুললাম। সে বির বির করে বললো, 'চশমা ছাড়া আমি কিছু দেখতে পাই না। আমার মায়োপিয়া চোখের পাওয়ার সিক্স ডাইওপটার।' চশমার একটা

কাঁচ খুলে পড়ে গিয়েছিলো। এক কাঁচের চশমা পরে সে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। তাকে বাড়ী না পৌঁছানো পর্যন্ত সে আমার বা হাত শক্ত করে ধরে রাখলো। সম্ভবত ভয় পাচ্ছিলো, আমি তাকে ফেলে রেখে চলে যাব ?

কোন পুরুষ মানুষের এমন মেয়েদের মত চেহারা হয় আমার জানা ছিল না। পাতলা ঠোঁট। কাঁচবিহীন চোখের দিকে তাকালে মনে হয় কাজল পরানো। কিশোরীদের মত ছোট্ট চিবুক। আমি বললাম, 'আপনি কি করেন।'

ঃ ইংরেজীতে এম. এ. পরীক্ষা দেব।

ঃ তাই নাকি, ভাল।

ঃ গত বৎসর পরীক্ষা দেবার কথা ছিল। দেইনি। আমার হার্টের অসুখ, হার্ট বিটের রিদমে গণ্ডগোল আছে।

ঃ চিকিৎসা করছেন তো ?

ঃ এর কোনো চিকিৎসা নেই,

এই বলেই সে ফ্যাকাশ ভাবে হাসতে লাগলো। আমি সিগারেট বের করলাম, 'নেন, সিগারেট নেন।'

ঃ আমি সিগারেট খাই না। নিকোটিন হার্টের মাসলে ক্ষতি করে। ফাইবারগুলি শক্ত করে দেয়।

ঃ এতসব জানলেন কি ভাবে ?

ঃ আমার মা ডাক্তার।

নিউ ইস্কাটনের যে বাড়ির সামনে রিকশা থামলো সেটাকে বাড়ি বলা ঠিক না। সেটা একটা হুলুস্থুল ব্যাপার। আমরা রিকশা থেকে নামতেই চারদিকে ছুটাছুটি পড়ে গেলো। সাব্বিরের মত দেখতে একজন মহিলা তীক্ষ্ম কণ্ঠে বলতে লাগলেন, 'কেন তুমি কাউকে কিছু না বলে বেরুলে ? আর বেরুলেই যখন কেন গাড়ি নিলে না ?'

সাব্বির অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে হাসতে লাগলো। ভদ্রমহিলা অভিমানী স্বরে বললেন, 'কেন তুমি আমাদের কষ্ট দাও ?'

ঃ আর যাব না মা।

ঃ তোমার দুর্বল হার্ট। যে কোন সময় কিছু একটা যদি হয়ে যেত। তখন ?

ঃ মা আর যাব না।

এ ছেলেটাই সাব্বির।

রাত ৮টার আগে আমি এদের বাড়ি থেকে বেরুতে পারলাম না। সাব্বিরের বাবা এবং মা এমন একটা ভাব করতে লাগলেন যেন আমি সাব্বিরকে মৃত্যুর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছি। এ রকম বড় একটা কাজের যোগ্য পুরস্কার দিতে না পেরে তারা দুজনেই অস্থির।

আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে এবং বাড়ি চিনে আসবার জন্যে একজন লোক চললো আমার সঙ্গে। ছোট গলিতে বড় গাড়ী ঢুকবে না—এই জন্য টেলিফোন করে একটা ছোট গাড়ী আনানো হলো।

সাব্বির মা বাবার নিষেধ অগ্রাহ্য করে আমাকে এগিয়ে দিতে এলো গেট পর্যন্ত। নীচু স্বরে বললো, 'বাবা মা আমার জন্যে খুব ব্যস্ত। একটা মাত্র ছেলে তো।'

ঃ আপনি একাই নাকি ?

ঃ জ্বি পাঁচ ভাই বোন ছিলাম আমরা। এখন আমি একা আছি।

ঃ বাকীরা কোথায় ?

ঃ সবাই মারা গেছে। আমাদের ফ্যামিলিতে কেউ বেশী দিন বাঁচে না। আমার এক চাচা ছিলেন তাঁরও চার ছেলে মেয়ে ছিল। সবাই ত্রিশ হবার আগেই মারা গেছে।

ঃ বলেন কি।

ঃ জ্বি। আমিও বাঁচব না।

ঃ আরে এসব কি বলছেন ?

ঃ জ্বি সত্যি কথাই বলছি। দেখেন না হার্টের অসুখ হয়ে গেলো।

আমার বন্ধু-বান্ধবরা সব আমার মত। পাস করবার পর

অতি দ্রুত সবাই কিছু একটাতে ঢুকে পড়েছি। ব্যাংক ট্রাভেল এজেন্সী নাইট কলেজের পার্ট টাইম টিচার। একমাত্র আজিজ কোথাও কিছু-না পেয়ে ল'তে ভর্তি হয়েছে। ছুটি-ছাটার দিনে তাশ টাশ খেলি। মাঝে মধ্যে পরিমলদের মামার বাড়িতে ভি সি আর দেখি এবং প্রায় সবদিনই আড্ডাটা শেষ হয় একটা ঝগড়ার মধ্যে। কোন কোন সময় হাতাহাতির পর্যায় চলে যায়। তাতেও অসুবিধা হয় না কিছু। আবার যখন দেখা হয় পুরানো কথা আর মনে থাকে না। বিয়ে করার আগ পর্যন্ত এই সময়টা বেশ সুখের। চায়ের দোকানে বসে বিস্বাদ চায়ে চুমুক দেয়া মাত্র মনে হয় জীবনটা বড়ই সুখের। ফজলুদের ভাড়াটেদের ছোট মেয়ের হৃদয়হীনতা আমাদের ফজলুর চেয়েও বেশী আহত করে।

এ রকম সুখের সময়ে উপদ্রপের মত মাঝে মাঝেই উপস্থিত হয় সাব্বির। তাদের গাড়ীর মুশকো ড্রাইভার চায়ের দোকান থেকে আমাকে ডেকে নিয়ে যায়। সাব্বির লজ্জায় লাল হয়ে বলে, চা খাচ্ছিলেন সবাই মিলে ?

ঃ হুঁ আড্ডা দিচ্ছি, আসুন না।

ঃ জ্বি না আমি চা খাইনা।

ঃ চা না খেলে না খাবেন বসে গল্প করেন।

ঃ আরেকদিন আসব। আজ একটু কাজ আছে।

কাজ থাকলে চলে গেলেই হয়। তা না অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে। বিরক্তিতে আমার গা জ্বলে যায় তবু ভদ্রতা করে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।

ঃ কি নিয়ে এত গল্প করেন ?

ঃ গল্প করার টপিকের অভাব আছে নাকি ? রাজনীতি, মেয়ে-মানুষ, সিনেমা, প্রেম। এসে শুনেন না। শুনতে না চাইলে বলেন।

ঃ কি বলব ?

ঃ প্রেমের অভিজ্ঞতার কথা বলবেন।

সাব্বির টমেটোর মত লাল হয়ে বললো, 'মেয়েদের বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা নেই। আমি কোন মেয়ের সঙ্গে সামনা-সামনি

বসে কথা বলিনি।'

ঃ বলেন কি?

ঃ জ্বি সত্যি। আমি একাই থাকি। মেয়েদের সঙ্গে মেশা আমার মা পছন্দ করেন না। আমার হার্টের অসুখ।

ঃ তাতে কি?

ঃ মানে ইয়ে—সামান্যতম এক্সাইটমেন্টে রিদমে গণ্ডগোল হয়। মেজর প্রবলেম হতে পারে।

আমি ঝামেলা মুক্ত হবার জন্য বলি, 'আজ তাহলে যান রোদ লাগছে। সাব্বির তবু যায় না। দাঁড়িয়ে থাকে। তার একটু দূরে এ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মুশকো ড্রাইভার। কুৎসিত ব্যাপার।

মেয়েলী চেহারার এই যুবকের সুখ দুঃখের সাথে আমার সুখ-দুঃখের কোন মিল নেই। এর সঙ্গে নরম স্বরে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতে আমার ভাল লাগে না। আমি সাব্বিরকে এড়িয়ে চলবার জন্য নানান রকম কৌশল করি। ঘরে বসে থেকে কাজের ছেলে-টিকে বলে পাঠাই—বাসায় নেই। কখন ফিরবে তারো ঠিক নেই। কোন কোন দিন নিজেই গিয়ে বলি—আমি এক্ষুণি বেরুব। হাস-পাতালে এক বন্ধুকে দেখতে যাবার কথা। আজতো কথা বলতে পারছি না।

ঃ আসুন, হাসপাতলে পৌঁছে দেই। কোন হাসপাতাল?

ঃ না না তার কোন দরকার নেই।

ঃ আমার কোন অসুবিধা হবে না, আসুন না।

মহা বিরক্তিকর ব্যাপার। রাস্তায় কোন সাদা রঙের গাড়ি দেখলেই মনে হয় এই বুঝি গাড়ি থামিয়ে ফর্সা পাঞ্জাবী পরা সাব্বির বেরিয়ে আসবে। মোটা কাঁচের আড়ালে যার চোখ ঢাকা বলে মনের ভাব বোঝা যাবে না। কথা বলবে এমন ভাল মানুষের মত যে রাগ করা যাবে না আবার সহ্যও করা যাবে না।

রাস্তায় বেরুলেই একটা অস্পষ্ট অস্বস্তি থাকে। এই বুঝি দেখা হলো। অস্বস্তিটা সবচে বেশী হয় নীলু সঙ্গে থাকলে।

নীলু তার কারণ বুঝতে পারে না। সে বিরক্ত হয়ে বলে, 'এ-রকম কর কেন? দেখা হলে কি হবে? আমারতো ভদ্র লোককে দেখতেই ইচ্ছা করছে।' একদিন অবশ্যি দেখা হলো। গ্রীন রোড দিয়ে হেঁটে হেঁটে আসছি হঠাৎ দেখি রাস্তার পাশে সাদা গাড়িটি দাঁড়িয়ে। গাড়ির ভেতরে থেকে সাব্বির অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। আমি না দেখার ভান করলাম। এবং অতি দ্রুত একটা রিকশা ঠিক করে নীলুকে নিয়ে উঠে পড়-লাম। সারাক্ষণই ভয় করতে লাগলো এক্ষুণি হয়ত সে গাড়ি নিয়ে সামনে এসে থামবে। লাজুক গলায় বলবে, 'কোথায় যাবেন বলুন, নামিয়ে দি।' সেরকম কিছু ঘটলো না। নীলু বিরক্ত হয়ে বললো হঠাৎ হুট করে রিকশা নিলে কেন? আমি কতবার বলেছি পাশা পাশি রিকশায় চড়তে আমার ভাল লাগে না।

ঃ ভাল লাগে না কেন?

ঃ হুড তুলতে হয়। হুড তুললেই আমার কেন জানি দম বন্ধ হয়ে আসে।

ঃ হুড না তুললেই হয়।

ঃ পাগল, হুড না তুলে অবিবাহিত একটা ছেলের সঙ্গে আমি রিকশায় চড়ব?

বিকালটা আমার চমৎকার কাটলো। দুজনে খুব ঘুরলাম। সন্ধ্যাবেলা ঢুকে পড়লাম একটা চাইনীজ রেষ্টুরেন্টে। নীলু সারা-ক্ষণই বললো, 'ইস বাসার সবাই দুঃশ্চিন্তা করছে।' তবু উঠবার কোন তাড়া দেখালো না।

নীলুকে শ্যামলীতে রেখে বাসায় ফিরে দেখি সাব্বির আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কি ব্যাপার?'

ঃ কোন ব্যাপার না এম্নি আসলাম। দিনে এলেতো আপ-নাকে পাওয়া যায় না।

ঃ কোন বিশেষ কাজে এসেছেন, না এমনি গল্প করবার জন্য?

ঃ না কোন কাজে না এম্নি। সাব্বির রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে লাগলো। আমি বললাম, 'চা খান। চা দিতে বলি।'

: ঝি না, চা টা না। আমি এখন যাব। মা চিন্তা করছেন এত রাত পর্যন্ত বাইরে কখনো থাকি না।

ঃ আজই বা থাকলেন কেন।

: আপনাদের দুজনকে আজ দেখলাম। বড় ভাল লাগলো। সেইটা বলবার জন্যে।

সাব্বির লজ্জায় বেগুনী হয়ে গেলো।

: আমাকে আর নীলুকে দেখেছেন বুঝি ?

: ঝি। বড় ভাল লাগলো। আমি একবার ভাবলাম এগিয়ে গিয়ে বলি, 'কোথায় যাবেন বলুন পৌঁছে দেই। আপনারা কি মনে করেন এই ভেবে গেলাম না।

আমি নিঃশব্দে একটা সিগারেট ধরালাম। সাব্বির মৃদু স্বরে বললো আমি অবশ্যি আপনাদের পেছনে পেছনে গিয়েছি।'

: তাই নাকি ?

: ঝি, ড্রাইভারকে বললাম দূর থেকে ঐ রিকশাটাকে ফলো করো।

ঃ তারপর ফলো করলেন ?

: ঝি। শাহাবাগ পর্যন্ত। তারপর ড্রাইভার আর রিকশাটা লোকেট করতে পারল না। আপনি কি রাগ করছেন ?

ঃ না।

আমি একবার ভেবেছিলাম আপনাকে বলব না। কিন্তু আপনাদের দুজনকে এত সুন্দর লাগছিলো। কি সুখী সুখী লাগছিলো আমার মনে হলো এটা বলা উচিত, আপনি রাগ করেননি তো ?

আমি ঠাণ্ডা স্বরে বললাম, না রাগ করিনি। রাত অনেক হয়ে গেছে এখন বাসায় যান। নয়ত আপনার মা আবার রাগ করবেন।

: ঝি তা ঠিক।

সাব্বির চলে গেল কিন্তু আমার বিরক্তির সীমা রইল না। লোকটি কি নির্বোধ না অন্য কিছু ? আমার মনে একটা ক্ষীণ সন্দেহ হলো। এরকম ঘটনা আবার ঘটবে, ও যদি আমাকে এবং নীলুকে আবার কখনো দেখে তাহলে আবারো তার সাদা গাড়ি আসবে পেছনে

পেছনে। কি অসহ্য অবস্থা।

ঘটলোও তাই। দিন সাতেক পর সাব্বির এসে হাসি মুখে বললো, 'আপনারা কি বুধবার বিকালে শিশু পার্কের সামনে ফুচকা খাচ্ছিলেন ?,

: মনে নেই।

আপনার পরনে ছিল একটা চেক চেক সার্ট আর আপনার বান্ধবীর গায়ে লাল রঙ্গের চাদর। হাতে একটা চটের ব্যাগ, মনে পড়েছে ?

ঃ হ্যা, পড়েছে।

ঃ আমি কিন্তু ফুচকা খাবার পর থেকে ঠিক কাঁটায় কাঁটায় এক ঘণ্টা আপনাকে ফলো করেছি।

ঃ তাই নাকি ?

: ঝি।

ঃ এত ভাল লাগছিলো আমার। ড্রাইভারকে বললাম তারা দেখতে পায় না এমন ভাবে তাদের ফলো করো। আপনি অবশ্যি একবার পেছনে তাকিয়েছেন কিন্তু কিছু বুঝতে পারেননি।

আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, 'নীলুর সঙ্গে থাকলে আমি একটু অন্য মনস্ক থাকি।

সাব্বির গভীর আগ্রহে বললো, 'আচ্ছা এলিফেন্ট রোডের ঐ দোকানটা থেকে কি কিনলেন আপনারা ?' আমি তার জবাব না দিয়ে গম্ভীর হয়ে বললাম, 'আসুন, আপনার সঙ্গে নীলুর পরিচয় করিয়ে দেই।'

না না তার কোন দরকার নেই। আপনাদের দুজনকে এক সঙ্গে দেখতেই আমার ভাল লাগে। কি রকম অদ্ভুত সুখী সুখী চেহারা। জানেন আমি মাকে আপনাদের কথা বলেছি ?

: ভাল করেছেন।

: আমি যে মাঝে মাঝে আপনাদের পেছনে যাই আপনি রাগ করেন না তো ?

আমি উত্তর না দিয়ে সিগারেট ধরালাম। একটা সাদা গাড়ি

সর্বত্র আমাদের অনুসরণ করছে এটা ভাবতেই মন শক্ত হয়ে যায়।

সাব্বির বসে আছে আমার সামনে। তার ফর্সা কিশারীদের মত মুখে উত্তেজনার ছাপ কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। চোখ চক চক করছে বোধ হয় কেঁদেই ফেলবে। সে আনেকখানি ঝুকে এসে বললো, 'পৃথিবীর মানুষ এত সুখী কেন বলুনতো ?'

সাব্বিরের সঙ্গে এটাই আমার শেষ দেখা। আর কখনো সে আমার কাছে আসেনি। হয়ত শরীর খুব বেশী খারাপ। ঘর থেকে বেরুতে পারছে না। কিংবা গিয়েছে বাইরে। কিংবা অন্য কিছু। গিয়ে খোঁজ নেবার মত ইচ্ছা কখনো হয়নি।

সাব্বির আর কখনো আসেনি কিন্তু তার সাদা গাড়িটি ঠিকই অনুসরণ করেছে আমাদের। যখনই নীলু মজার একটা কিছু বলেছে কিংবা যখনই হাত ধরতে ইচ্ছা হয়েছে তখনই বুঝতে পারছি বিশাল সাদা গাড়িটি আশে পাশে কোথাও আছে। এর হাত থেকে আমাদের মুক্তি নেই।

নীলুর সঙ্গে শেষ পর্যন্ত আমার বিয়ে হয়নি। যে মেয়েটিকে বিয়ে করেছি সে নীলুর মত নয়। কিন্তু তার জন্যেও আমি প্রচণ্ড ভালোবাসা অনুভব করি। বৃষ্টির রাতে যখন হঠাৎ বাতি চলে যায়, বাইরে হাওয়ার মাতামাতি শুরু হয় আমি গভীর আবেগে হাত রাখি তার গায়ে। তখনি মনে হয় কাছেই কোথাও সাদা গাড়ীটি বৃষ্টিতে ভিজছে। চশমা পরা একটি তরুণ ভুরু কুঁচকে ভাবছে মানুষ এত সুখী কেন ?'

গোপন কথা

আজ আমাদের ঘুম ভাঙ্গলো খুব ভোরে।

আলো তখনো ভাল করে ফোটেনি। জানালার ওপাশে অন্ধকার গাঢ় হয়ে আছে। আকাশে ক্ষীণ আলোর রেখা ! এমন আলো আঁধারিতে মন অন্য রকম হয়ে যায়। পৃথিবীর সবাইকে ভালবাসতে ইচ্ছে করে।

আমি পৃথিবীর সবাইকে ভালবেসে ফেললাম। আমার পাশের চৌকীতে বাকের সাহেব ঘুমিয়ে। অন্ধকারে তাঁকে দেখা যাচ্ছে না তবু আমি নিশ্চিত জানি তিনি একটি কুৎসিত ভঙ্গিতে ঘুমিয়ে আছেন। মুখের লালায় তাঁর বালিশ ভিজে গেছে। লুঙ্গী উঠে গেছে কোমরে। তাতে কিছু যায় আসে না। আজ আমার চোখে অসুন্দর কিছু পড়বে না বারেক সাহেবকেও আমি ভালবাসব।

'বৎসরের অন্যদিনগুলি আজকের মত হয় না কেন ?' ভাবতে ভাবতে আমি একটা সিগারেট ধরালাম। হিটার জ্বালিয়ে চায়ের কেতলি বসিয়ে দিলাম। সমস্ত ব্যাপারটা ঘটলো নিঃশব্দে তবু বাকের সাহেবের ঘুম ভেঙে গেলো। তিনি জড়ানো গলায় বললেন,

চা হচ্ছে নাকি ?

ঃ হ্যাঁ।

: আজ এত ভোরে উঠলেন যে ব্যাপার কি ?

: ব্যাপার কিছু না।

: শরীর খারাপ নাকি ?

ঃ জ্বি না। চা খাবেন বাকের সাহেব ?

ঃ দেন এক কাপ।

এই বলেই মাথা বের করে তিনি নাক ঝাড়লেন। নাক মুছলেন মশারীতে—কি কুৎসিত ছবি। আজ চমৎকার সব ছবি দেখতে

ইচ্ছা করছে। আমি প্রাণপণে ভাবতে চেষ্টা করলাম বাকের সাহেব নামে এ ঘরে কেউ থাকে না। এবং এটা যেন তেন কোন ঘড়ও নয়। এটা হচ্ছে মহিমগড়ের রাজবাড়ি। এবং আমি এসেছি মহিমগড়ের রাজকন্যার অতিথি হয়ে। এবং আমিও কোন হেজি-পেজি লোক নই। আমি একজন কবি। আজ সন্ধ্যায় মহিমগড়ের রাজকন্যাকে আমি কবিতা শুনাবো।

ঃ মঞ্জু সাহেব!

ঃ জ্বি বলেন।

ঃ এ রকম লাগছে কেন আপনাকে। কিছু হয়েছে নাকি?

ঃ না কি হবে।

ঃ দেখি একটা সিগারেট দেন দেখি।

বাকের সাহেব তাঁর সাপের মত কালো রোগা হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। একটা সিগারেট দিলাম। অথচ আমি নিশ্চিত জানি-বালিশের নিচে তাঁর নিজের সিগারেট আছে। বাকের সাহেব নিজের সিগারেট কমই খান। আহ্ কি সব তুচ্ছ জিনিস নিয়ে ভাবছি। আজ আমি একজন অতিথি কবি। আমার চিন্তা-ভাবনা হবে কবির মত। আমি নরম স্বরে ডাকলাম, 'বাকের সাহেব!'

ঃ জ্বি।

ঃ আজ আমার কেন জানি বড় ভাল লাগছে।

ঃ ভাল লাগার কি আছে আজকে?

বাকের সাহেব বড়ই অবাক হলেন। তাঁর কাছে আজকের দিনটি অন্য সব দিনের মতই। সাধারণ। ক্লান্তিকর। আমি মৃদু-স্বরে ডাকলাম, 'বাকের সাহেব।'

ঃ বলেন।

ঃ আজ আমার জন্মদিন।

ঃ তাই নাকি?

ঃ জ্বি। এগারোই বৈশাখ।

ঃ আম কাঁঠালের সিজনে জন্মেছেন রে ভাই।

এই বলেই বাকের সাহেব চায়ের কাপ নিয়ে বাথরুমে ঢুকে

গেলেন। আজ আমি রাগ করবো না। চমৎকার একটি সকালকে কিছুতেই নষ্ট হতে দেব না। সন্ধ্যাবেলা যাব নীলুদের বাড়িতে। সন্ধ্যা হবার আগে পর্যন্ত শুধু ওর কথাই ভাববো।

বাকের সাহেব বাথরুম থেকে ফিরে এসে বলেন, 'পাইখানা কষা হয়ে গেছে ভাই।' আমি শুনেও না শোনার ভান করলাম। আজ আমি অসুন্দর কিছুই শুনব না। আজ আমার জন্মদিন। আজ নীলুদের বাসায় যাব এবং তাকে গোপন কথাটি আজ বলব।

ঝড় হোক। বৃষ্টি হোক। কিংবা প্রচণ্ড টর্নেডো হোক। কিছুই আসে যায় না। আজ সন্ধ্যায় আমি ঠিকই যাব নীলুদের বাসায়। নীলুর বাবা হয়তো বসে থাকবেন বারান্দায়। তিনি আজকাল বেশীর ভাগ সময় বারন্দাতেই থাকেন। অপরিচিত কাউকে দেখলেই কপালের চামড়ার ভাজ ফেলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকান। আমার দিকেও তাকাবেন। আমি হাসিমুখে বলব, 'নীলুফার কি বাসায় আছে? ওর সঙ্গে আমার একটা কথা ছিল।' আমি উত্তেজিত অবস্থায় ঠিকমত কথা বলতে পারি না। কথা গলায় আটকে যায়। কিন্তু আজ আমার কোন অসুবিধা হবে না। আজ কথা বলব অভিনেতা-দের মত।

চা শেষ করেই বাকের সাহেব ঘুমুবার আয়োজন করলেন। গলা টেনে টেনে বললেন, 'ন'টা পর্যন্ত ঘুমাব। তারপর উঠে নাশতা খেয়ে আবার ঘুম। ছুটির দিনে ঘুম কাকে বলে দেখবেন। ম্যারা-থন ঘুম। হা হা হা। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর নিঃশ্বাস ভারী হয়ে এলো। বারান্দায় এসে দেখি আলো ফুটছে। আকাশ হালকা নীল। পাখির কিচির-মিচির শুনা যাচ্ছে। গোপন কথা বলার জন্যে এরচে' সুন্দর দিন আর হবে না।

সকাল এগারোটায় টেলিফোন করলাম। নীলুকে টেলিফোনে কখনো পাওয়া যায় না। আজ পাওয়া গেলো। নীলু কিশো-রীদের মত বললো, 'কে কথা বলছেন?

ঃ আমি মঞ্জু।

ঃ ও মঞ্জু ভাই। আপনি কেমন আছেন?

: ভাল। তুমি কেমন আছ নীলু?

: আমিও ভাল।

ঃ কি করছিলে?

: পড়ছিলাম। আবার কি করব? আমার অনার্স ফাইন্যাল না?

: ও তাইতো। আচ্ছা শোন নীলু, তুমি কি আজ সন্ধ্যায়-বাসায় থাকবে?

: থাকব না কেন?

: আমি একটু আসব তোমাদের ওখানে।

ঃ বেশতো আসুন।

: একটা কথা বলব তোমাকে?

ঃ কি কথা?

ঃ গোপন কথা?

: আপনার আবার গোপন কথা কি?

নীলু খিল খিল করে হাসতে লাগলো। কি সুন্দর সুরেলা হাসি। কি অদ্ভুত লাগছে শুনতে।

: হ্যালো নীলু!

ঃ বলুন শুনছি।

ঃ আসব আজ সন্ধ্যায়।

: বেশতো আসুন। রাখলাম এখন। নাকি আরো কিছু বলবেন।

: না এখন আর কিছু বলব না। নীলু রিসিভার নামিয়ে রাখার পরও আমি অনেকক্ষণ রিসিভার কানে লাগিয়ে বসে রইলাম।

মাত্র এগারোটা বাজে, আরো আট ঘন্টা কাটাতে হবে। কোথায় যাওয়া যায়? কোথায়ও যেতে ইচ্ছে করছে না। নিউ মার্কেটে কিছুক্ষণ হাঁটলাম একা একা। এবং একসময় দামী একটা সার্ট কিনে ফেললাম। অন্যদিন হলে সার্টের দাম আমার বুকে বিঁধে থাকতো আজ থাকলো না। দামের কথা মনেই রইলো না।

দশটি ফাইভ ফাইভ কিনলাম এ্যালিফেন্ট রোড থেকে। অন্তত

আজকের দিনটিতে দামী সিগারেট খাওয়া যেতে পারে। নীলুর জন্য কিছু একটা উপহার নিয়ে গেলে হয় না? কি নেয়া যায়? সুন্দর মলাটের একটা কবিতার বই। সেখানে খুব গুছিয়ে একটা কিছু লিখতে হবে যেমন, "নীলুকে—দেখা হবে চন্দনের বনে।" বইটি দেয়া হবে ফিরে আসার সময়। নীলু নিশ্চয়ই তাকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে আসবে। তখন বলব, 'নীলু, আজ কিন্তু আমার জন্মদিন।' নীলু বলবে, 'ওমা আগে বলবেনতো?'

ঃ আগে বললে কি করতে?

ঃ কেন উপহার-টুপহার কিনে রাখতাম।

ঃ কি উপহার?

ঃ কবিতার বই-টই।

ঃ আমিতো কবিতা পড়ি না।

ঃ না পড়লেও বই উপহার দেয়া যায়।

ঠিক এই সময় আমি মোড়ক খুলে বইটি তার হাতে দিয়ে অল্প হাসব। হাসতে হাসতেই বলব, 'অমি তোমার জন্য একটা কবিতার বই এনেছি নীলু।'

সন্ধ্যাবেলা আকাশে খুব মেঘ করলো। এবং একসময় শোঁ শোঁ শব্দে বাতাস বইতে শুরু করলো। নীলুদের বারান্দায় পা রাখা-মাত্র সত্যি সত্যি ঝড় শুরু হলো। কারেন্ট চলে গেল। সমস্ত অঞ্চল ডুবে গেলো অন্ধকারে। নীলু আমাকে দেখে অবাক হয়ে বললো, 'এই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে এসেছেন? ভিজে গেছেন দেখি। আসুন ভেতরে আসুন। কি যে কাণ্ড করেন? কাল এলেই হতো।'

বসার ঘরে মোমবাতী জ্বলছে। একজন বুড়োমত ভদ্রলোক বসে আছেন। তার পাশে বিলু। বিলু আমাকে দেখেই হাসিমুখে বললো, 'স্যার ভূতের গল্প বলছেন। উফ যা ভয়ের। তারপর স্যার বলেন।'

নীলু বললো, 'দাঁড়ান স্যার আমি এসে নেই। চায়ের কথা বলে আসি।'

নীলু চায়ের কথা বলে এলো। একটা তোয়ালে আমার দিকে

বাড়িয়ে বললো, 'মাথা মুছে ফেলেন তারপর স্যারের গল্প শুনেন। প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স। বানানো গল্প না।'

ঃ তোমার সংগে আমার একটা কথা ছিলো নীলু।

ঃ দাঁড়ান গল্পটা শুনে নেই।

ঃ আমি ঢাকা ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

ঃ তাই নাকি ?

ঃ কৃষি ব্যাংকে চাকরি হয়েছে একটা। ফিফথ গ্রেড অফিসার।

ঃ বাহ্ বেশতো। আসুন এখন গল্প শুনেন।

নীলু আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলো—স্যার ইনি হচ্ছেন আমার বড় ভাইয়ের বন্ধু। যে ভাই ওয়াশিংটন ডি· সি-তে থাকেন তাঁর। নীলুর বড় ভাই বলেন, 'বসুন।' আমি বসলাম। ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে গল্প শুরু করলেন, 'পথ-ঘাট অন্ধকার। শ্রাবণ মাস। আকাশে খুব মেঘ করেছে। আমি আর আমার বন্ধু তারাদাস পাশাপাশি যাচ্ছি। এমন সময় একটা শব্দ শুনলাম। যেন কেউ একজন ছুটতে ছুটতে আসছে। তারাদাস বললো, 'কে ? কে ?' তখন শব্দটা থেমে গেলো।

ভদ্রলোক ভালোই গল্প করতে পারেন। নীলু বিলু মুগ্ধ হয়ে শুনছে। নীলু শাড়ি পরেছে একটা। পরার ভংগিটির মধ্যে কিছু একটা আছে। তাকে বিলুর চেয়েও কম বয়স্ক লাগছে। যেন সিক্স-সেভেন পড়া বালিকা শখ করে শাড়ি জড়িয়েছে।

গল্প শেষ হতে অনেক সময় লাগলো। নীলু উঠে গিয়ে চা নিয়ে এলো! আমি বললাম, 'তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিলো।'

নীলু অবাক হয়ে বললো, 'একবারতো বলেছেন ?'

ঃ কি বললাম ?

ঃ কৃষি ব্যাংকে চাকরি নিয়ে ময়মনসিংহ যাচ্ছেন।

ঃ এ কথা না। অন্য একটা কথা।

ঃ ঠিক আছে বলবেন। দাঁড়ান স্যারের কাছে থেকে আরেকটা গল্প শুনি। স্যার আরেকটা বলেন।

ভদ্রলোক গল্প বলার জন্যে তৈরী হয়েই এসেছেন। সঙ্গে সঙ্গে

তাঁর দ্বিতীয় গল্প-শুরু করলেন। গল্প হতে হতে অনেক রাত হয়ে গেল। বৃষ্টিও কিছুটা কমে এসেছে। নীলু ব্যস্ত হয়ে তাদের ড্রাই-ভারকে গাড়ি বের করতে বললো।

আমি স্যারের পাশে বসলাম। নীলু হালকা গলায় বললো, আবার আসবেন মঞ্জু ভাই।

গাড়ী চলতে শুরু করতেই বীলুর স্যার বললেন, 'আপনি কি ভূত বিশ্বাস করেন ?' আমি তার জবাব দিলাম না। ভূতে বিশ্বাস করি কি না করি তাতে কিছুই যায় আসে না। আমি পরশু দিন চলে যাব। অনেক দিন আর ঢাকায় আসা হবে না। আর এলেও গোপন কথা বলার ইচ্ছা হবে না হয়তো। বিলুর স্যার বললেন, 'পৃথিবীতে অনেক ষ্ট্রেঞ্জ ঘটনা ঘটে বুঝলেন মঞ্জু সাহেব, নাইনটিন সিক্সটিতে একবার কি হয়েছে শুনেন ·····।'

ঃ আরেক দিন শুনব আজ আমার মাথা ধরেছে।

আমাদের এদিকেও বাতি নেই। অন্ধকার ঘরে বাকের সাহেব শুয়ে আছেন। আমাকে ঢুকতে দেখেই ক্লান্ত স্বরে বললেন, শরীরটা খারাপ করছে ভাই। বমি হয়েছে কয়েকবার। একটু সাবধানে আসেন, পরিষ্কার করা হয় নাই।

সব পরিষ্কার করে ঘুমুতে যেতে আমাদের অনেক রাত হলো। বাইরে আবার মুষল ধারে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বাকের সাহেব মৃদু স্বরে বললেন, 'ঘুমালেন নাকি ভাই ?'

ঃ জ্বি না।

ঃ আপনার জন্মদিন উপলক্ষে এক প্যাকেট সিগারেট এনে-ছিলাম। গরীব মানুষ কি আর দেই বলেন। বাকের সাহেব অন্ধকারে এগিয়ে দিলেন সিগারেটের প্যাকেটটি। আমি নীচু স্বরে বললাম, 'একটা কথা শুনবেন ?'

ঃ কি কথা ?

ঃ গোপন কথা। কাউকে বলতে পারবেন না।

বাকের সাহেব বিছানায় উঠে বসলেন। বাইরে মুষল ধারে বৃষ্টি পড়ছে। আজ বোধ হয় পৃথিবী ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। যে গোপন কথাটি বলা হয়নি সেটি আমি বলতে শুরু করলাম। আমার ভালোই লাগলো।

একজন সুখী মানুষ

জাকের সাহেবের বয়স ছাপ্পান্ন।

কিছুদিন আগেও তাঁর বয়স ছাপান্নই মনে হত। এখন মনে হচ্ছে হঠাৎ যেন তাঁর বয়স অনেকখানি বেড়ে গেছে। আয়নার দিকে তাকালেই মনে হয় সত্তর বছরের এক অচেনা বুড়ো বসে আছে। অথচ তিনি একজন সুখী মানুষ। অসম্ভব সুখী। সুখী মানুষের বয়স বাড়ে না। কিন্তু তাঁর বেলায় এরকম হচ্ছে কেন ?

তিনি দাড়ি কামাতে কামাতে এইসব ভাবতে লাগলেন। সম্ভবত অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। ঘ্যাস করে তাঁর গাল কেটে গেল। বড় বড় কয়েক ফোঁটা রক্ত পড়ল বেসিনে। অনেকখানি কেটেছে কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে ব্যথা লাগছে না। বয়সের লক্ষণ। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে স্নায়ু অসাড় হয়ে আসে। ব্যথাবোধের তীব্রতা কমে আসে।

জাকের সাহেব ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুলে গাল চেপে ধরে অভ্যাসের বসেই বললেন, 'উহ্'। বলে তিনি নিজে খুবই অবাক হয়ে গেলেন। 'উহ্' বলার কোন দরকারই ছিল না। কেন বললেন ?

নাস্তার টেবিলে তাঁর মিলির সঙ্গে দেখা হল। মিলি তাঁর বড় মেয়ে। নাস্তার সময়টাতে সে বাবার সামনে বসে পর পর দু'কাপ চা খায়। অল্প কিছু কথাবার্তা হয় আজ মিলি অস্বাভাবিক গম্ভীর। অনেকক্ষণ সে বাবার দিকে তাকালোই না।

জাকের সাহেব এক চুমুকে কমলার রসটা খেয়ে ফেললেন। সিরিয়েলের বাটিতে দুধ ঢাললেন। চিনি মিশালেন। শুকনো চোখে তাকালেন রুটি মাখনের প্লেটের দিকে। আরেকটি বাটিতে

গাঢ় লাল রঙের কি একটা তরল পদার্থ দেখা যাচ্ছে। টমেটোর স্যুপ নাকি ? স্যুপটা আগে খাওয়া দরকার ছিল। কোন কিছুই মুখে নিতে ইচ্ছা করছে না। রুচি নষ্ট হয়ে গেছে। বয়েসের লক্ষণ। একটা বয়সে ভাল কিছু আর খেতে ইচ্ছা করে না।

: বাবা, তোমার গালে কি হয়েছে ?

: কিছু না।

: কিছু না মানে। গালতো অনেকখানি কেটেছে।

: হঠাৎ করে শেভ করতে গিয়ে……।

: ইলেকট্রিক শেভার ব্যবহার করনি।

জাকের সাহেব চুপ করে রইলেন। এই যন্ত্রটি তাঁর পছন্দ নয়। চালু করলেই কেমন বিজবিজ শব্দ হয়। গালে ছোঁয়ালেই সমস্ত শরীর শিরশির করতে থাকে।

: বাবা, কাটা জায়গায় কিছু দিয়েছ ?

: না।

: স্যাভলন-ট্যাভলন কিছুই না ?

: না।

মিলির মুখ আরো গম্ভীর হয়ে গেল। তিনি খুব বিব্রতবোধ করতে লাগলেন।

: একি বাবা, তুমি ডিমটা খাচ্ছ না কেন ?

: ইচ্ছা করছে না।

: ইচ্ছা না করলেতো হবে না। দুদিন পর পর তোমাকে একটা ডিম খেতে হবে। এই বয়সে তোমার ডায়েট ঠিক রাখা খুবই জরুরী।

: তাতো ঠিকই।

: আজ ডাক্তার সাহেব আসবেন না ?

: হুঁ আসবেন।

: গালটা তাকে দেখাবে।

: ঠিক আছে।

: কোন জিনিস অবহেলা করতে নেই।

ঃ তাতো ঠিকই।

তিনি সিদ্ধ ডিমে গোলমরিচের গুঁড়া ঢালতে ঢালতে সেটাকে কালো বানিয়ে ফেললেন। ডিমটা শেষ করতে তার অনেক সময় লাগল। কিছুতেই গলা দিয়ে নামতে চাচ্ছে না। দু'একবার বমির মত হল। চমৎকার সব সুখাদ্য কিন্তু খাওয়া যাচ্ছে না। বয়স দ্রুত বয়স বাড়ছে তাঁর। আজকাল অল্প হাঁটলেই বুকে হাঁপ ধরে। সিঁড়ি বেয়ে উঠবার সময় রেলিং ধরে ধরে উঠতে হয়। অথচ তাঁর বয়স মাত্র ছাপ্পান্ন।

জাকের সাহেব হাঁটতে বেরুলেন। গালের কাটাটায় চিনচিনে একটা ব্যথা হচ্ছে। কেন হচ্ছে কে জানে। বেরুবার সময় তাঁর জামাই তাঁকে খানিকটা ভয় পাইয়ে দিয়েছে। চিন্তিত মুখে বলেছে, গাল হচ্ছে শরীরের সবচে সেনসেটিভ পার্ট, একে মোটেই অবহেলা করা উচিত না। সামান্য ক্ষতই সেপটিক হয়ে সিরিয়াস ব্যাপার হতে পারে।

জামাইয়ের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা বিশেষ হয় না। শরীর খারাপ হলে বা অসুখ বিসুখ হলেই সে শুধু খোঁজ নিতে আসে। আজ যেমন নিয়েছে। রাতেও একবার খোঁজ নেবে।

জাকের সাহেব রাস্তার মোড়ের এক পানওয়ালার দোকান থেকে একটা ফাইভ ফাইভ কিনলেন। মিহির বাবুর সঙ্গে তাঁর দেখা হল। মিহির বাবু পাশের বাড়িতে থাকেন। অল্পদিন হল রিটায়ার করেছেন। মিহির বাবু অবাক হয়ে বললেন, সিগারেট কিনলেন নাকি?

ঃ জ্বি।

ঃ আপনি সিগারেট খান জানতামনাতো।

ঃ খাই না। এই আজ একটা কিনলাম।

ঃ কোন উপলক্ষ্য-টুপলক্ষ্য নাকি?

ঃ না না উপলক্ষ্য কিছু না এমনি।

জাকের সাহেব লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসলেন। মিহির বাবু বললেন, কোথাও যাচ্ছেন না কি?

ঃ জ্বি না, এই একটু হাঁটছি। মর্নিং ওয়াক।

ঃ সকাল দশটায় মর্নিং ওয়াক?

ঃ না মানে এই হাঁটা আর কি।

ঃ আপনার ছেলেরা ভাল আছে?

ঃ জ্বি ভাল।

ঃ তারা যেন কোথায় আছে?

জাকের সাহেব অন্তরঙ্গ গলায় বলেন, দুজনেই আমেরিকাতে। একজন নর্থ ডাকোটায় অন্যজন সিয়াটলে।

ঃ আরেক মেয়েজামাই জাপান না কোথায় আছে বলেছিলেন যেন।

ঃ হনলুলু।

ঃ আপনি তো ভাই সুখী মানুষ।

ঃ তা ঠিক।

ঃ চিন্তা ভাবনা কিছু নাই। এখন শুধু দেশে বিদেশে ঘুরে বেড়ানো। আজ জাপান, কাল আমেরিকা পরশু হনলুলু।

জাকের সাহেব লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসলেন। সিগারেট টানার জন্যেই বোধ হয় তার মাথা হালকা হালকা লাগছে। বমি বমি ভাব হচ্ছে একটা পান খেতে পারলে হত। মিহির বাবু বিমর্ষ ভঙ্গিতে বলেন আমার অবস্থাটা দেখেন দুটা মেয়ের এখনো বিয়ে হয় নাই। এর মধ্যে রিটায়রমেন্ট হয়ে গেল। যাই কোথায় এখন বলেন? সারা জীবনে একটা বাড়ি টারি কিছু করতে পারলাম না এখন যাচ্ছি গোরান। পাঁচটা টাকা নিয়ে বের হয়েছি কারণ কি জানেন?

ঃ না।

ঃ বেশী নিলে যদি খরচ হয়ে যায় সেই ভয়ে। আচ্ছা ভাই গেলাম। বাস ধরতে হবে।

আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে জাকের সাহেবও পাঁচটা টাকা নিয়ে বের হয়েছেন। নগদ টাকা তাঁর কাছে থাকে না। অবশ্যি থাকার প্রয়োজনও তেমন নেই। নগদ টাকা দিয়ে তিনি কি করবেন? প্রতিদিন বাজারে যাবার আগে তোতা মিয়া এসে জিজ্ঞেস করে,

আপনার কিছু লাগবে? লাগলে কন।

মিলি সব সময়ই বলে, বাবা তোমার প্রচুর টাকা আছে। তোমার দুই ছেলে প্রতিমাসে যত টাকা পাঠায় সেটা তুমি এই জীবনে খরচ করে শেষ করতে পারবে না। সব আলাদা করা আছে, যখন যা লাগবে বলবে।

ঃ তাতো বলবই।

ঃ কোন্ লজ্জা করবে না।

ঃ না লজ্জা কি জন্যে।

ঃ যদি কোথাও বেড়াতে টেড়াতে যেতে ইচ্ছা করে বলবে।

ঃ হু তাতো বলবই।

যখন যত টাকা লাগে চাইবে আমার কাছে। ক্যাশ টাকা তোমার ঘরে রাখতে চাই না। পাঁচ ছ'জন কাজের লোক। নগদ টাকা দেখলে লোভ সামলাতে পারবে না। শেষে স্বভাব নষ্ট হবে।

ঃ তা ঠিক।

ঃ তোমার যখন যা ইচ্ছা করে আমাকে বলবে।

ঃ হু বলব।

জাকের সাহেব, বলার মত তেমন কিছু কখনো খুঁজে পাননি। যে ঘরে তিনি থাকেন লাল রঙ্গের ছোট একটা ফ্রীজ আছে। বার ইঞ্চি একটি রঙ্গিন টি ভি আছে। যে খাটে তিনি ঘুমান তার গদিটি আট ইঞ্চি ফোমের।

বিছানার পার্শ্বেই বেতের একটা ইজি চেয়ার। হাতের কাছে বইয়ের সেলফ। নিউজ উইক এবং টাইম এই দুটি পত্রিকা শুধু তার জন্যেই রাখা হয়। একজন ডাক্তার আছেন যিনি সপ্তাহে একবার (বুধবার সন্ধ্যা) এসে তাঁর ব্লাড প্রেসার মেপে যান। মিলি ঘড়ির কাটা ধরে প্রতি রাত দশটায় এসে বাতি নিভিয়ে যায়। রাত জাগলে তার শরীর খারাপ করবে তাই। তার খাটের পাশে একটা সুইচ আছে যা টিপলেই রান্না ঘরে কলিং বেল বেজে উঠে। তোতা মিয়া ছুটে এসে জিজ্ঞেস করে কিছু লাগবে কিনা।

গত সপ্তাহেই ছোট মেয়ের চিঠি পেলেন। সে লিখছে বাবা

তুমি কি হনলুলু বেড়াতে আসতে চাও? তিন মাসের ভিজিটার্স ভিসা নিয়ে চলে এসো না। তোমার খারাপ লাগবে না। বড় আপার চিঠিতে দেখলাম তুমি সারাক্ষণ বিষণ্ন হয়ে থাক। এর কারণ কি? তোমার কি কোন কিছুর অভাব আছে? মিলি কি তোমার যত্ন টত্ন ঠিকমত করছে না? কোন রকম সংকোচ না করে লিখবে।

তাঁর কোন অসুবিধা নেই। মিলি তার খুব ভাল যত্ন করছে। তিনি যথেষ্ট সুখে আছেন। তাঁর এখন মনেই পড়ে না এক কালে তিনি দরিদ্র ছিলেন। চারটি ছেলেমেয়েকে মানুষ করতে গিয়ে মাথা খারাপের জোগাড় হয়েছিল। এক সময় এও ভেবেছিলেন ফয়সল আই এস সি পাশ করা মাত্র তাকে কোন একটা চাকরিতে ঢুকিয়ে দেবেন। ভাগ্যিস সে রকম কিছু করেননি। অমানুষিক কষ্ট করেছেন ছেলেদের জন্য। তারাও মনে রেখেছে সে সব।

যেবার তাঁর রক্ত আমাশা হল কি ব্যস্ত হয়ে পড়ল সবাই। প্রতিরাতে টেলিফোন। এতদুর থেকে টেলিফোন নিশ্চয়ই ছ'সাত-শ' টাকা করে লাগত। বড় ছেলে মাসিক বরাদ্দের টাকা ছাড়াও বাড়তি এক হাজার ডলার পাঠিয়েছে চিকিৎসা খরচের জন্যে। মিলিকে লিখেছে বাবার সেবা যত্নের জন্যে চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে একজন নার্স রেখে দেবে। খরচের জন্যে চিন্তা করবে না।

তাঁর দু' ছেলেরই হাত খুব দরাজ। তাদের কথা মনে হলেই একটা তৃপ্তির ভাব আসে মন ভাল হয়ে যায়। তারা অনেক কিছু করেছে তাঁর জন্যে কিন্তু তিনি নিজের বাবা-মার জন্যে কিছুই করতে পারেন নি। বাবা শেষ বয়সে বড় ভায়ের সঙ্গে থাকতেন। বড় ভাই ঘন ঘন চিঠি লিখতেন—

"বাবাকে আমার ঘাড়ে ফেলিয়া তোমরা সকলে কি প্রকারে নিশ্চিন্ত আছ তাহা আমি বুঝিতে পারি না। বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে পালন করিবার দায়িত্ব কি আমার একার? তোমার কি কিছুই করিবার নাই? এই পত্র পাওয়া মাত্র বাবার খরচ হিসাবে অতি অবশ্যই পঞ্চাশ টাকা মনিঅর্ডার যোগে পাঠাইবা। আমি বিশেষ অসুবিধায় আছি।"

এ জাতীয় চিঠি তিনি সব সময় উপেক্ষা করেছেন। সে জন্যে অবশ্যি তাঁর কোন অপরাধ বোধ নেই। তিনি দরিদ্র ছিলেন। খুবই দরিদ্র। বাবাকে দেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

জাকের সাহেব, দুপুর এগারোটার দিক বাসায় ফিরলেন। মিলি বিরক্ত হয়ে বলল, কোথায় কোথায় ঘুরছিলে রোদের মধ্যে। তিনি অপ্রতিভ ভঙ্গিতে হাসলেন।

ঃ কিছু খাবে এখন?

ঃ না।

ঃ ঠাণ্ডা কিছু খাও। বেলের সরবত করে দিক?

ঃ ঠিক আছে দিতে বল।

ঃ তুমি ঘর থেকে যাবার পর পর ফয়সল টেলিফোন করেছিল। গালকাটার খবর বললাম। সে খুব বিরক্ত হয়েছে। বার বার বলছিল বাবা এত অসাবধান কেন।

তিনি লজ্জিত বোধ করতে লাগলেন, মিলি বলল এখন থেকে তোতা মিয়া তোমার শেভ করে দেবে বুঝলে?

ঃ আচ্ছা।

জাকের সাহেব, বরফ দেয়া ঠাণ্ডা বেলের সরবত খুব তৃপ্তি করে খেলেন। জিনিসটা ভালই। মিলি বলল, সিদ্দিক আজ আবার এসেছিল।

তিনি শংকিত বোধ করলেন। সিদ্দিক তাঁর বড় ভায়ের ছেলে। কিছু দিন পর পরই সাহায্যের জন্যে আসে। মিলি বিরক্ত হয়।

ঃ আজ এসেই সে একটা মিথ্যা কথা ফেঁদেছে। বলছে তুমি নাকি তাকে আসতে বলেছ। তুমি নাকি সেলাই মেশিন কিনবার টাকা দেবে। বলেছ নাকি?

জাকের সাহেব মাথা নাড়লেন, তিনি কিছু বলেননি। মিলি কঠিন স্বরে বলল, ভিক্ষাবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেয়া ঠিক না।

ঃ তাতো বটেই।

ঃ আমি আজ কড়া এক ধমক দিয়েছি।

ঃ ধমক দেয়ার কি দরকার ছিল?

ঃ ধমক দেব না? আমার সামনে এসট্রের মধ্যে কাশ ফেলল। রাগে আমার গা জ্বলে গেছে। তুমি যাও গরম পানি করা হচ্ছে। গোসল সার। গালে পানি লাগিও না।

রাত আটটায় বড় ছেলে সিয়াটল থেকে টেলিফোন করল।

বাবা তোমার গাল কেমন?

ঃ ভাল।

ঃ মিলি বলল তুমি নাকি ইলেকট্রিক সেভার ব্যবহার কর না।

ঃ এখন থেকে করব।

ঃ আমরা খুব চিন্তিত বুঝলে বাবা?

ঃ বুঝেছি।

ঃ নাও টুকুনের সঙ্গে কথা বল।

টুকুন বাংলা বলতে পারে না। সে একগাদা কথা বলে গেল। জাকের সাহেব শুধু ঘন ঘন মাথা নাড়লেন এবং ফাঁকে ফাঁকে বললেন, 'ইয়েস ইয়েস'।

রাত দশটার কিছু পরে ছোট মেয়ের টেলিফোন এল হনলুলু থেকে। কানেকশন ভাল নয়। কিছুই প্রায় শোনা যায় না।

ঃ বাবা, তুমি এত অসাবধান কেন?

ঃ এখন থেকে সাবধান হব।

ঃ ভাইয়া টেলিফোন করে আমাকে জানাল। আমি চিন্তায় অস্থির। খুব বেশী কেটেছে?

ঃ না খুব বেশী না।

ঃ বিদেশে থাকি সারাক্ষণ ভয়ে ভয়ে থাকতে হয় কখন কি খবর এসে পড়ে।

ঃ ভয় নাই। আমি অনেক দিন বাঁচব।

কথাটা হয়ত ঠিক। তাদের দীর্ঘজীবী বংশ। তার বাবা প্রায় অমর হয়ে গিয়েছিলেন। চোখে দেখেন না, কানে শুনেন না উঠে বসতে পর্যন্ত পারেন না তবু বেঁচে আছেন। তাঁর এত দীর্ঘ সময় বেঁচে থাকার কোন প্রয়োজন ছিল না। বেঁচে থেকে তিনি বড় ভাইকে প্রায় পাগল করে দিলেন। আর কিছুদিন বাঁচলে বড় ভাই

সত্যি সত্যিই হয়ত পাগল হয়ে যেতেন।

তিনিও কি তাই করবেন দীর্ঘ দিন বেঁচে থেকে সবাইকে পাগল করে তুলবেন ?

জাকের সাহেব বাতি নিভিয়ে ঘুমুতে গেলেন। রাত বারেটায় তাঁকে ডেকে তোলা হল। ছোট ছেলে কায়সার টেলিফোন করেছে নর্থ ডাকোটা থেকে। জাকের সাহেব ঘুম ঘুম চোখে ওঠে বসলেন। মিলি চমকে ওঠে বলল, কি সর্বনাশ তোমার গালের এ অবস্থা কেন ?

সমস্ত মুখ ফুলে উঠেছে, বাম গাল এমন ফুলেছে যে একটা চোখ প্রায় বন্ধ হয়ে যাবার মত অবস্থা। মিলি এসে বাবার হাত ধরল।

ঃ ইস এতো অসম্ভব জ্বর। বাবা তুমি শুয়ে থাক।

জাকের সাহেব শুয়ে থাকলেন না টেলিফোন ধরতে নিচে নেমে গেলেন।

ঃ হ্যালো কায়সার।

ঃ হ্যা। বাবা তুমি কেমন আছ ?

ঃ ভাল খুব ভাল। খুব চমৎকার আছি।

এ পর্যন্ত বলে তিনি হাসতে লাগলেন। হাসতে হাসতেই বললেন, এত সহজে আমি মরছি না। বুঝলি আমি দীর্ঘ দিন বাঁচব। এক সময় চোখে টোখে দেখব না। কানে শুনব না। বিছানায় উঠে বসতেও পারব না। তবু বেঁচে থাকব।

ঃ এইসব তুমি কি বলছ বাবা ?

জাকের সাহেব হাসতে লাগলেন। একজন সুখী মানুষের হাসি। আনন্দ ও তৃপ্তির হাসি।

জলিল সাহেবের পিটিশন

তিনি হাসি মুখে বললেন, 'আমি দু'জন শহীদ মুক্তিযোদ্ধার বাবা। সেভেন্টি ওয়ানে আমার দু'টি ছেলে মারা গেছে।' আমি অবাক হয়ে তাকালাম। ভদ্রলোকের চেহারা বিশেষত্বহীন। বয়স প্রায় ষাটের কোঠায়। সে তুলনায় বেশ শক্ত সমর্থ। বসেছেন মেরুদণ্ড সোজা করে। চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। চশমা-টশমা নেই। তার মানে চোখে ভালই দেখতে পান। আমি বললাম, 'আমার কাছে কি ব্যাপার ?

ভদ্রলোক যে ভাবে বসেছিলেন সে ভাবেই বসে রইলেন। সহজ সুরে বললেন, একজনের ডেডবডি পেয়েছিলাম। মালিবাগে কবর দিয়েছি। আমার ছোট মেয়ের বাড়ি আছে মালিবাগে।

ঃ তাই নাকি ?

ঃ জ্বি। মালিবাগ চৌধুরী পাড়া।

ঃ আমার কাছে কেন এসেছেন ?

ঃ গল্পগুজব করতে আসলাম। নতুন এসেছেন এ পাড়ায়। খোঁজ খবর করা দরকার। আপনি আমার প্রতিবেশী।

ভদ্রলোক হাসি মুখে বসে রইলেন। আমার সন্দেহ হলো, তিনি হয়তো সত্যি সত্যি হাসছেন না। তার মুখের ফাটাটাই হাসি হাসি। ভদ্রলোক শান্ত স্বরে বললেন, 'আমি আপনার পাশের গলিতেই থাকি।'

ঃ তাই নাকি ?

ঃ জ্বি। ১৩/২, বাসার সামনে একটা নারিকেল গাছ আছে দেখেছেন তো ?

আমি দেখিনি। তবু মাথা নাড়লাম। ভদ্রলোকের চরিত্র স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। সম্ভবত অবসর জীবন যাপন করেছেন। কিছুই করবার নেই। সময় কাটানোটাই বোধহয় তার এখন একমাত্র সমস্যা।

যার জন্যে ছুটির দিনে প্রতিবেশী খুঁজতে হয়।

: আমার নাম আবদুল জলিল।

আমি নিজের নাম বলতে গেলাম ভদ্র লোক বলতে দিলেন না! উঁচু গলায় বললেন, 'চিনি আপনাকে চিনি।'

: চা খাবেন? চায়ের কথা বলি?

: জ্বি না। আমি চা খাই না। চা সিগারেট কিছুই খাই না। নেশার মধ্যে পান খাই।

: পানতো দিতে পারব না এখানে কেউ পান খায় না।

: পান আমার সঙ্গেই থাকে। ভদ্রলোক কাঁধের ঝোলাতে হাত ঢুকিয়ে পানের কৌটা বার করলেন। বেশ বাহারী কৌটা। টিফিন কেরিয়ারের মত তিন চারটা আলাদা বাটি আছে। আমি একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস গোপন করলাম। ভদ্রলোক লম্বা পরিকল্পনা নিয়ে এসেছেন। সারা সকালটাই হয়তো এখানে কাটাবেন। নিজের ছেলে দু'টির কথা ইনিয়ে বিনিয়ে বলবেন। দুঃখ কষ্টের গল্প অন্যকে শোনাতে সবাই খুব পছন্দ করে। ভদ্রলোক একটু ঝুকে এসে বললেন, প্রফেসার সাহেব আপনি একটা পান খাবেন?

: জ্বি না।

: পান কিন্তু শরীরের জন্য ভাল। পিত্ত ঠাণ্ডা রাখে। যারা পান খায় তাদের পিত্তের দোষ হয় না।

: তাই নাকি?

: জ্বি। পানের রস আর মধু হল গিয়ে বাতের খুব বড় ওষুধ।

আমি ঘড়ি দেখলাম। সাড়ে দশটা। আজ ইউনিভার্সিটি নেই। থাকলে সুবিধা হতো। বলা যেত 'কিছু মনে করবেন না এগারোটার সময় একটা ক্লাস আছে আপনি অন্য আরেক দিন সময় হাতে নিয়ে আসুন।' ছুটির দিনে এরকম কিছু বলা যায় না।

ভদ্রলোক তার পানের কৌটা খুলে নানান রকম মশলা বের করলেন। প্রতিটি মশলা শুঁকে শুঁকে দেখলেন। পান বানালেন অত্যন্ত যত্নে। যিনি পান বানানোর মত তুচ্ছ ব্যাপারে এতটা সময় নষ্ট করেন তিনি যে আজ দুপুরের আগে নড়বেন না তাতে কোন

সন্দেহ নেই।

কিন্তু আশ্চর্য ভদ্রলোক পান মুখে দিয়েই উঠে দাঁড়ালেন। হাসি মুখে বললেন, 'যাই, আমি অনেকটা সময় নষ্ট করলাম।' বিস্ময় সামলে আমি আন্তরিকভাবেই বললাম, 'বসুন, এত তাড়া কিসের?' তিনি বললেন না আমি তাঁকে সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম। ফেরার পথে দেখি বাড়িওয়ালা বারান্দায় ভ্রু কুঁচকে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, 'প্রফেসার সাহেবকে ধরেছে বুঝি? সিগনেচার করেছেন?'

: কি সিগনেচার?

: জলিল সাহেবের পিটিশনে সিগনেচার করেন নি?

: পিটিশনটা কিসের?

: আমাকে বলতে হবে না। নিজেই টের পাবেন। হাড় ভাজা করে দিবে। কোন প্রশ্রয় দিবেন না।

অস্পষ্ট একটা অস্বস্তি নিয়ে ঘরে ফিরলাম। নতুন পাড়ায় আসার অনেক বিরক্তিকর ব্যাপার আছে। নতুন নতুন মানুষদের সঙ্গে পরিচিত হতে হয়। সে পরিচয় অনেক সময়ই সুখকর হয় না। তবে জলিল সাহেব প্রসঙ্গে ভয়টা বোধহয় অমূলক। এর পর তাঁর সঙ্গে দু'বার দেখা হলো। বেশ সহজ স্বাভাবিক মানুষ। একবার দেখা গ্রীন ফার্মেসীর সামনে। তিনি হাসি মুখে এগিয়ে এলেন, প্রফেসার সাহেব না। ভাল আছেন?

: জ্বি ভাল। আপনি ভাল আছেন? কই আরতো আসলেন না।

: সময় পাইনা। খুব ব্যস্ত। পিটিশনটার ব্যাপারে।

আমি আর কথা বাড়ালাম না। ক্লাশের দোহাই দিয়ে রিকশায় উঠে পড়লাম। দ্বিতীয় বার দেখা হলো নিউ মার্কেটের একটা নিউজ ষ্টাণ্ডের সামনে। দেখি তিনি উবু হয়ে বসে একটির পর একটি পত্রিকা দ্রুত পড়ে শেষ করছেন। হকার ছেলেটি ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাঁকে দেখছে।

: কি জলিল সাহেব কি পড়ছেন এত মন দিয়ে?

জলিল সাহেব আমার দিকে তাকালেন। মনে হয় ঠিক চিনতে পারলেন না। তাঁর চোখে চশমা।

ঃ চশমা নিয়েছেন নাকি?

ঃ জ্বি! সন্ধ্যা হলে মাথা ধরে। প্লাস পাওয়ার। ভাল আছেন প্রফেসার সাহেব?

ঃ জ্বি ভাল।

ঃ যাব একদিন আপনার বাসায়। পিটিশনটা দেখাব আপনাকে। চৌদ্দ হাজার তিন'শ সিগনেচার জোগাড় হয়েছে।

ঃ কিসের পিটিশন?

ঃ পড়লেই বুঝবেন। আপনারা জ্ঞানী-গুণী মানুষ আপনাদের বুঝতে কষ্ট হবে না।

আমার ধারণা ছিল সরকারের কাছে কোন সাহায্য টাহায্য চেয়ে পিটিশন করা হয়েছে। সেখানে চৌদ্দ হাজার সিগনেচারের ব্যাপারটা বুঝা গেলো না। আমি নিজে থেকেও কোন আগ্রহ দেখালাম না। জগতে অসুস্থ্য মানুষের সংখ্যা কম নয়। সিগনেচার সংগ্রহ কারো যদি নেশা হয় তা নিয়ে আমার উদ্বিগ্ন হবার কোন কারণ নেই।

কিন্তু উদ্বিগ্ন হতে হলো। জলিল সাহেব এক সন্ধ্যায় তাঁর চৌদ্দ হাজার তিন'শ সিগনেচারের ফাইল-পত্র নিয়ে আমার বাসায় উপস্থিত হলেন। হাসি হাসি মুখে বললেন, 'ভাল করে পড়েন প্রফেসার সাহেব।' আমি পড়লাম। পিটিশনের বিষয় বস্তু হচ্ছে—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে দশ লাখ ইহুদী মারা গিয়েছিল। সেই অপরাধে অপরাধীদের প্রত্যেকের বিচার করা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। কিন্তু এ দেশের ত্রিশ লক্ষ মানুষ মেরে আপরাধীরা কি করে পার পেয়ে গেলো? কেন এ নিয়ে আজ কেউ কোন কথা বলছে না। জলিল সাহেব তার দীর্ঘ পিটিশনে সরকারের কাছে আবেদন করেছেন যেন এদের বিচার করা হয়।

আমি ভদ্রলোকের দিকে তাকালাম তিনি শান্ত স্বরে বললেন, আমার দুটি ছেলে মারা গেছে, সেই জন্যেই যে আমি এটা

করছি তা ঠিক না। আমার ছেলে মারা গেছে যুদ্ধে। ওদের মৃত্যুর জন্য আমি কোন বিচার চাই না। আমি বিচার চাই তাদের জন্যে যাদের ওরা ঘর থেকে ধরে নিয়ে মেরে ফেলেছে। আমার কথা বুঝতে পারছেন?

ঃ পারছি।

ঃ জানি পারবেন। আপনি জ্ঞানী গুণী মানুষ। অনেকেই পারে না। বুঝলেন ভাই অনেকে মানবতার দোহাই দেয়। বলে বাদ দেন। ক্ষমা করে দেন। ক্ষমা এত সস্তা? এ্যাঁ বলেন সস্তা?

আমি কিছু বললাম না। জলিল সাহেব পানের কৌটা বের করে পান সাজাতে বসলেন। শান্ত স্বরে বললেন, 'আপনি কি মনে করছেন আমি ছেড়ে দিব? ছাড়ব না। আমার দুই ছেলে ফাইট দিয়েছে। আমিও দিব। মৃত্যু পর্যন্ত ফাইট দেব। দরকার হলে বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের সিগনেচার জোগাড় করব। ত্রিশ লক্ষ লোক মরে গেল আর কেউ কোন শব্দ করল না? আমরা মানুষ না অন্য কিছু বলেন দেখি?'

আমি সিগনেচার ফাইল উল্টে দেখতে লাগলাম। খুব গোছানো কাজ কর্ম। সিগনেচারের পাশে বর্তমান ঠিকানা ও স্থায়ী ঠিকানা। স্বাধীনতা যুদ্ধে নিহত আত্মীয় স্বজনের নাম ঠিকানা।

ঃ অনেকেই মনে করে আমার মাথা ঠিক নাই। এক পত্রিকা অফিসে গিয়েছিলাম সম্পাদক সাহেব দেখাই করলেন না। ছোকরা মত একটা ছেলে বললো, 'কেন পুরানা কাঁসুন্দি ঘাটছেন? বাদ দেন ভাই।' আমি তার দাদার বয়সী লোক আমাকে বলে ভাই।

ঃ আপনি কি বললেন?

ঃ আমি বললাম, 'তুমি চাও না এদের বিচার হোক? ছেলেটি কিছু বলে না। সরাসরি না বলারও সাহস নাই। অথচ এই সব ছেলেরা কত সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। করে নাই?'

ঃ জ্বি করেছে।

ঃ আপনার বাড়িওয়ালার কথাই ধরেন। তাঁর এক শালাকে

ঘর থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে মরে ফেলেছে। অথচ এই লোক সিগনেচার করেনি। ত্রিশ লক্ষ লোক মরে গেলো কোন বিচার হলো না। মনে হলেই বুকের মধ্যে চিন চিন ব্যথা হয়।

আমি অত্যন্ত অস্বস্তি নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। ভদ্রলোক দ্বিতীয় একটি পান মুখে পুরে বললেন, 'সরকারী লোকজনদের সঙ্গে দেখা করেছি। তারা আমি কি বলতে চাই সেটাই ভাল করে শুনতে চায় না। একজন আমাকে বলল, 'আপনি একটা পরিত্যক্ত বাড়ির জন্যে দরখাস্ত করেন। আপনার দু'টি ছেলে মারা গেছে বাড়ি পাওয়ার হক আছে আপনার।'

: আপনি কি বললেন।

: আমি আবার বলব কি? বাড়ির জন্যে আমি পিটিশন করেছি নাকি? বাড়ি দিয়ে আমি করবটা কি? আমার দুই ছেলের জীবন কি এত সস্তা? একটা বাড়ি দিয়ে দাম দিতে চায়? কতবড় স্পর্ধা চিন্তা করেন। আমি চাই একটা বিচার হবে। একটা বিচার চাই। আর কিছুই না। সভ্য সমাজের নিয়মমত বিচার হবে। বুঝলেন?

: জ্বি বুঝলাম।

: আপনারা জ্ঞানী-গুণী মানুষ আপনাদের বুঝাতে কষ্ট হয় না। অন্যরা কেউ বুঝতে চায় না। একেকটা সিগনেচারের জন্যে তিনবার করে যেতে হয়। তাতে অসুবিধা নাই। অমি ছাড়বার লোক না?

আমার সিগনেচার নিয়ে ভদ্রলোক চলে গেলেন। তারপর অনেকদিন তার সঙ্গে দেখা হলো না। একটা কৌতুহল জেগে রইলো। রাস্তা ঘাটে দেখা হলে জিজ্ঞেস করেছি কি ভাই কতদূর করলেন?

: চালিয়ে যাচ্ছি প্রফেসার সাহেব। দোয়া রাখবেন।

: লোকজন দস্তখত দিচ্ছে তো?

: সবাই দেয় না। ভয় পায়।

: কিসের ভয়?

: ভয়ের কি কোন মা বাপ আছে? ভয় পাওয়া যাদের স্বভাব

তারা ভয় পাবেই। বুঝলেন না? আমি আছি লেগে। আদালতে হাজির করে ছাড়ব। কি বলেন প্রফেসার সাব?

: তাতো ঠিকই।

: ডিষ্টিক্টে ভাগ করে ফেলছি। এখন সব ডিষ্টিক্টে যাব। কষ্ট হবে উপায়তো নাই। আপনি কি বলেন?

: ভালইতো।

: তাছাড়া শুধু দস্তখত জোগাড় করলেও হবে না। কেইস চালানোর মত এভিডেন্স থাকতে হবে। বিনা কারণে নিরপরাধ লোকজন ধরে ধরে মেরেছে এটা প্রমাণ করতে হবে না। ওরা ঘাগু ঘাগু সব 'লইয়ার' দিবে। দিবে না?

: তাতো দিবেই।

: আপনার জানামত ভাল লইয়ার আছে?

: আমি খোঁজ করব।

: তাতো করবেনই। আপনিতো অন্ধ না। অন্যায়টা বুঝতে পারছেন। বেশির ভাগ লোকই পারে না। মূর্খের দেশ।

অনেকদিন আর জলিল সাহেবের দেখা পাই নাই। হয়তো সত্যি সত্যি জেলায় জেলায় ঘুরে বেড়াতে শুরু করেছেন। বগলে ভারী ভারী ফাইল। দস্তখতের সংখ্যা হয়ত বাড়ছে। বার হাজার থেকে পনেরো হাজার। পনেরো থেকে বিশ। এমন কি সত্যি সত্যি হতে পারে যে চল্লিশ পঞ্চাশ লাখ দস্তখত জোগাড় করে ফেলবেন তিনি। পঞ্চাশ লাখ লোকের দাবী অত্যন্ত জোরালো দাবী।

বর্ষার শুরুতে খবর পেলাম জলিল সাহেব অসুখে পড়েছেন। হাঁপানি সেই সঙ্গে রিউমেটিক ফিবার। বাড়িওয়ালা বললেন, পাগল মানুষ। শরীরের যত্ন তো কোনদিন করে নাই। এ যাত্রা টিকবে না।

: বলেন কি?

: হ্যাঁ। গ্রীন ফার্মেসীর ডাক্তার সাহেব বললেন। আমি নিজেও গিয়েছিলাম দেখতে।

: অবস্থা কি বেশী খারাপ?

: বর্ষাটা টিকে কিনা···

: বলেন কি ?

: খুবই খারাপ অবস্থা।

বর্ষাটা অবশ্যি টিকে গেলেন। ফাইলপত্র বগলে দিয়ে ঘুরতে বেরুলেন। আমার সঙ্গে দেখা হলো এক দুপুরে। আমি চিনতেই পারি না এমন অবস্থা। তিনি এগিয়ে এলেন, 'প্রফেসর সাহেব না ?'

: আরে কি ব্যাপার ভাই ? একি অবস্থা আপনার।

: বাঁচব না বেশি দিন।

: না বাঁচলে চলবে ? এত বড় একটা প্রজেক্ট হাতে নিয়েছেন।

: ঐটার জন্যেই টিকে আছি।

: সিগনেচার কতদূর জোগাড় হয়েছে ?

: পনরো হাজার। মাসে তিন চারশর বেশি পারি না। বয়স হয়েছেতো। তবে ছাড়বার লোক না আমি।

: না ছাড়বেন কেন।

: কাঠগড়ায় দাঁড়া করাবো শালাদের। ইহুদীরা পেরেছে আমরা পারব না কেন ? কি বলেন ?

: তাতো ঠিকই।

: ত্রিশ লাখ লোক মেরেছে বুঝলেন একটা দু'টা না। বাংলাদেশের মানুষ সস্তা না ? মজা টের পাইয়ে দেব।

আজিমপুরের ঐ পাড়ায় আমি প্রায় দু'বছর কাটালাম। এই দু'বছরে জলিল সাহেবের সঙ্গে মুটামুটি ঘনিষ্ঠতা হলো। মাঝে মাঝে যেতাম তার বাসায়। ভদ্রলোকের নিজের বাড়ি। দোতলাটা ভাড়া দিয়েছেন। ভাড়ার টাকায় সংসার চলে। স্ত্রী নেই। বড় ছেলের বউ তাঁর সঙ্গে থাকে। ফুটফুটে দুটি মেয়ে আছে সেই বউটির। যমজ মেয়ে বোধ করি। খুব হাসি খুশী ' ভালই লাগে ও বাড়ীতে গেলে। বউটি খুবই যত্ন করে।

পিটিশন সম্পর্কে বাচ্চা দু'টির ধারণাও দেখলাম খুব স্পষ্ট। একটি মেয়ে গম্ভীর হয়ে আমাকে বললো, 'দাদার খাতা লেখা শেষ হলে যারা আমার বাবাকে মেরেছে তাদের বিচার হবে।' এইটুকু মেয়ে

এত সব বোঝার কথা নয়। জলিল সাহেব নিশ্চয়ই ব্যাপারটা ওদের বুঝিয়ে বলেছেন।

ঐ পাড়া ছেড়ে চলে আসার পরও মাঝে মধ্যে যেতাম। তারপর ধীরে ধীরে যোগাযোগ কমে গেলো। এবং এক সময় দীর্ঘ দিনের জন্যে দেশের বাইরে চলে গেলাম।

যাবার আগে দেখা করতে গিয়েছি। শুনলাম তিনি ফরিদপুরে গিয়েছেন সিগনেচার যোগাড় করতে। কবে ফেরৎ আসবেন কেউ বলতে পারে না। তাঁর ছেলের বউ অনেক দুঃখ করলো। দুঃখ করার সঙ্গত কারণ আছে। একমাত্র পুরুষ যদি ঘর সংসার ছেড়ে দেয় তাহলে জীবন দুঃসহ হয়ে ওঠে।

বাইরে থাকলে দেশের জন্যে অন্য রকম একটা মমতা হয়। সেই কারণেই বোধহয় জলিল সাহেবের কথা মনে পড়তে লাগলো। মনে হতো ঠিকইতো ত্রিশ লক্ষ লোক হত্যা করে পার পেয়ে যাওয়া উচিত নয়। জলিল সাহেব যা করছেন ঠিকই করছেন। এটা মধ্য যুগ না। এ যুগে এত বড় অন্যায় সহ্য করা যায় না।

উইক এণ্ড গুলিতে বাঙালীরা এসে জড়ো হতো আমার বাসায়। কিছু আণ্ডার গ্রেজুয়েট ছেলে, মুরহেড ষ্টেট ইউনিভার্সিটির অংকের প্রফেসর আফসার উদ্দিন সাহেব। সবাই একমত জলিল সাহেবের প্রজেক্টে সব রকম সাহায্য করতে হবে। বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে প্রয়োজন হলে আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা দায়ের করা হবে। বিদেশী পত্রিকায় জনমতের জন্যে লেখালেখি করা হবে। আমেরিকার কার্গো শহরে আমরা এক সন্ধ্যাবেলায় 'আবদুল জলিল সংগ্রাম কমিটি' গঠন করে ফেললাম। আমি তার আহ্বায়ক। আফসার উদ্দিন সাহেব সভাপতি। বিদেশে বসে দেশের কথা ভাবতে বড় ভাল লাগে।

সব সময় ইচ্ছে করে একটা কিছু করি।

দেশে ফিরলাম ছ'বছর পর।

ঢাকা শহর অনেকখানি বদলে গেলেও জলিল সাহেবের বাড়ির চেহারা বদলায় নি। সেই ভাঙ্গা প্যালেস্তারা উঠা বাড়ি। সেই

নারিকেল গাছ। কড়া নাড়তেই চৌদ্দ পনেরো বছরের ভারী মিষ্টি একটি মেয়ে দরজা খুলে দিলো। অবাক হয়ে তাকালো আমার দিকে।

: তুমি কি জলিল সাহেবের নাতনী ?

: জ্বি।

: তিনি বাড়ি আছেন।

: না। দাদুতো মারা গেছেন দু'বছর আগে।

: ও। আমি তোমার দাদার একজন বন্ধু।

: আসুন ভেতরে এসে বসুন।

আমি বসলাম কিছুক্ষণ। মেয়েটির ম'ার সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা ছিলো। ভদ্র মহিলা বাসায় ছিলেন না। কখন ফিরবেন তারো ঠিক নেই। উঠে আসবার সময় জিজ্ঞেস করলাম, তোমার দাদু যে মানুষের সিগনেচার জোগাড় করতেন সেই সব আছে ?

: জ্বি আছে। কেন ?

: তোমার দাদু যে কাজটা শুরু করেছিলেন সেটা শেষ করা উচিত। তাই না ?

মেয়েটি খুবই অবাক হলো। আমি হাসি মুখে বললাম,

আমি আবার আসবো কেমন ?

: জ্বি আচ্ছা।

মেয়েটি গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসে নরম গলায় বলে, 'দাদু বলেছিলেন একদিন কেউ না কেউ এই ফাইল নিতে আসবে।'

আর যাওয়া হলো না।

উৎসাহ মরে গেলো। দেশের এখন নানান রকম সমস্যা। যেখানে সেখানে বোম ফোটে। মুখ বন্ধকরে থাকতে হয়। এর মধ্যে পুরানো একটি সমস্যা টেনে আনতে ইচ্ছা করে না।

আমি জলিল সাহেব নই। আমাকে ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হয়। মীরপুরে একটা পরিত্যক্ত বাড়ি কেনার জন্যে নানান ধরনের লোকজনদের সঙ্গে কথা বলতে হয়। জলিল সাহেবের বত্রিশ

হাজার দরখাস্তের ফাইল নিয়ে রাস্তায় বেরুনোর আমার সময় কোথায় ?

জলিল সাহেবের নাতনিটি হয়তো অপেক্ষা করে আমার জন্যে। দাদুর পিটিশনের ফাইলটি ধূলো ঝেড়ে ঠিক ঠাক করে রাখে। এই বয়েসী মেয়েরা মানুষের কথা খুব বিশ্বাস করে।

... .

শীত

... .

মাঝ রাতে মতি মিয়ার ঘুম ভেঙ্গে গেল।
বুকে একটা চাপা ব্যথা। দম বন্ধ হয়ে আসছে। শ্বাসের কষ্টটা শুরু হল বোধহয়। সে কাঁথার ভেতর থেকে মাথা বের করল। কি অসম্ভব ঠাণ্ডা! বুড়োমারা শীত পড়েছে। দরমার বেড়ার ফাঁক দিয়ে বরফ শীতল হাওয়া আসছে। হাতে পায়ে কোন সাড়া নেই। ঠাণ্ডায় জমে গেছে নাকি?

মতিমিয়া বড় বড় নিঃশ্বাস নিতে শুরু করল। শ্বাসকষ্ট শুরু হলে কিছুতেই ফুসফুস ভরানো যায় না। কেউ একটু হাওয়া করলে আরাম হত। ডাকবে নাকি ফরিদের মাকে? মতি নিয়া উঠে বসবার চেষ্টা করল। আশ্চর্যের ব্যাপার ব্যথাটা কমে গেল। নিঃশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এল। ঠিক তখন একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। মতি মিয়ার মনে হল কেউ যেন তাঁর কাঁথার ভেতর ঢুকে যাচ্ছে। অশরীরি কেউ। সে হাত রাখল মতি মিয়ার পেটে। অসম্ভব শীতল হাত। সেই হাতে বড় বড় আঙুল। একবার হাত রেখেই সে হাত সরিয়ে নিল। মতি মিয়া ভয় পেয়ে ডাকল, "বৌমা। ও ফরিদের মা।"

ফুলজান ফরিদকে নিয়ে রান্না ঘরে ঘুমায়। শ্বশুরের বেশীর ভাগ কথারই সে কোন জবাব দেয় না। আজ দিল। বিরক্ত স্বরে বলল,

: কি হইছে।
: কুপীটা ধরাওগো মা। বড় ভয় লাগতাছে।
: ঘুমান দেহি।
: কে জানি আমার পেটের মইধ্যে হাত দিল।
: স্বপ্নে দেখছেন। কার ঠেকা পরছে আপনের পেটে হাত দিব।

: ফরিদরে এট্টু দিয়া যাও আমার সাথে। দিয়া যাওগো মা। ও ময়না।
: খামাখা চিল্লাইয়েন না ঘুমান।
: ও ফরিদের মা ও বেটি ... ...।

ফুলজান সাড়া দিল না। মতি মিয়া একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। জমাট অন্ধকার চারদিকে। বেড়ার ফাঁক দিয়ে এক বিন্দু আলোও আসছে না। বোধহয় কৃষ্ণ পক্ষ। তার ভয়টা কিছুতেই কাটছে না। বুড়োকালে মানুষের ভয় বেড়ে যায়। অকারণেই গা ছম ছম করে। বুড়োকাল বড় অদ্ভুত কাল।

রান্নাঘরে খচমচ শব্দ হচ্ছে। ফুলজান কি জেগে আছে? নাকি ইঁদুর? ইঁদুরের বড় উৎপাত হয়েছে। ফুলজান বিড় বিড় করে কথা বলছে। কে জানে হয়তবা শেষটায় কুপী জ্বালাবে। দেখতে আসবে তাকে। যতটা খারাপ মনে হয় মেয়েটা তত খারাপ না। মায়া-মহব্বত আছে। মতি মিয়া কাঁথার ভেতর থেকে মাথা বের করল। কি ভয়ানক ঠাণ্ডা পড়েছে। এই শীতটা বোধ হয় কাটানো যাবে না। ভালমন্দ কিছু এবারই হবে।

: বৌমা ঘুমাইলা নাহি ও ফরিদের মা!
: কিতা?
: দুই কেঁথায় শীত মানে না।
: না মানলে আমি কি করমু কন?
: বুড়া কালে শীতটা বেশী লাগে। ফরিদরে দিয়া যাও আমার কাছে। ও ফরিদের মা।
: ফুলজান জবাব দেয় না।
: ও ফরিদের মা। ও ময়না।

লাভ হয়না কোন। মতি মিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ঘুমুতে চেষ্টা করে। ঘুম আসে না। বুড়োকালের এই এক যন্ত্রণা একবার ঘুম ছুটে গেলে আর ঘুম আসে না। শীতের রাত জেগে পার করা বড় কষ্ট! ফুলজানের দু'টো বাচ্চা থাকলে ভাল হত। একটাকে রাখতেন নিজের কাছে। পুলাপানের গায়ে জবর ওম। লেপের চেয়ে বশী

ওম। মেছের আলি বেঁচে থাকলেও হত। একটা জোয়ান ছেলে আশেপাশে থাকলেই ঘর বাড়ি গরম থাকে। মতি মিয়ার বুক হু হু করতে লাগল। বুড়োকালে আশেপাশে একটা জোয়ান ছেলে দরকার। মেছের আলির কথা তার বেশীক্ষণ মনে রইল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার ক্ষিধে লেগে গেল। অথচ ক্ষিধে লাগার কোনই কারণ নেই। শীতের শুরুতেই ভাতের কষ্ট দুর হয়েছে। ফুলজান রোজ দারোগা বাড়ি থেকে ভাত নিয়ে আসছে। একজনের ভাত কিন্তু তিনজনেরই ভরপেট হচ্ছে।

আজ খাওয়া হয়েছে টেংরা মাছের তরকারি ও ডাল দিয়ে। এইসব ছোটখাট জিনিস তার মনে থাকে না। কিন্তু আজকেরটা মনে আছে। কারণ টেংরা মাছের কাঁটা বিঁধে গিয়েছিল। বড় কষ্ট হয়েছে। শরীরের কষ্টটা এখন বেড়ে গেছে, অল্পতেই কষ্ট হয়।

রান্নাঘরে আবার শব্দ হচ্ছে। ব্যাপারটা কি ? ঘুম ভাঙ্গল নাকি ফরিদের ? মাঝে মাঝে ফরিদ চুপি চুপি চলে আসে তার কাছে। বুকের কাছে গুটিশুটি মেরে ঘুমায়। বড় আরাম লাগে। মতি মিয়া উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করে। এবং এক সময় অবাক হয়ে লক্ষ্য করে রান্না ঘরে কুপী জ্বালানো হয়েছে। বিজ বিজ শব্দ শোনা যায়। ফরিদের মা নিজের মনেই কথা বলছে নাকি ?

: বৌমা কি হইছে ?

: কিছু অয় নাই।

: বাত্তি জ্বালাইলা বিষয়ডা কি ?

: ফরিদ বিছানা ভিজাইছে।

: কও কি, শীতের মইধ্যে কামডা কি করল ?

একটা চড়ের শব্দ শুনা যায়। ফরিদ অবশ্যি কাঁদে না। মতি মিয়া উল্লসিত স্বরে চেঁচিয়ে উঠে—এরে দিয়া যাও আমার কাছে। মাইর ধুইর করার কাম নাই। পুলাপান মানুষ। ফুলজানের তরফ থেকে কোন সাড়া পাওয়া যায় না। এখানে আনবে না নিশ্চয়ই।

: ও বৌমা। ও ফরিদের মা।

: কি ?

: ভিজা কেঁথার মইধ্যে রাখন ঠিক না। বুকে কফ জমলে মুশকিলে পড়বা। দিয়া যাও আমার কাছে।

ফুলজানের দিক থেকে কোন সাড়া নেই। ফরিদ ঘুন ঘুন করে কাঁদতে শুরু করেছে। মতি মিয়া একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। আর তখনি ফুলজান ফরিদকে কোলে নিয়ে ঘরে ঢুকল। এক হাতে ধরে থাকা কুপীর সবটা আলো পড়েছে তার মুখে। মুখ থম থম করছে তার। বোধ হয় কেঁদেছে খানিকক্ষণ আগে। ফুলজান মাঝে মাঝে রাত জেগে কাঁদে। মতি মিয়া সরে নাতির জন্যে জায়গা করে দিল। ফরিদ চোখ বন্ধ করে আছে। ঘুমের ভান। এমন বজ্জাত হয়েছে। ফুলজান দাঁড়িয়ে আছে কুপী হাতে। কিছু বলবে বোধহয়।

: কিছু বলবা নাকি মা ?

: না।

শীতটা পড়ছে মারাত্মক। রশীদ সাবের কাছে কাইল একবার যাইবা নাকি ? কম্বল যদি দেয় একটা।

ফুলজান কিছু বলল না। কঠিন মুখে দাঁড়িয়ে রইল। মতি মিয়া একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস গোপন করল। ফরিদের মা যাবে না। যে কোন কারণেই হোক রশীদ সাবের কাছে সে যেতে চায় না। রিলিফের গম এল একবার। ফুলজান গেল না। পা টেনে টেনে যেতে হল মতি মিয়াকেই।

: ও ফরিদের মা।

: কি কইবেন কন ?

: যাইবা নাকি কাইল একবার রশীদ সাবের কাছে ?

: কম্বলের আমার দরকার নাই। শীত লাগে না আমার।

: তোমার না লাগলে কি আমার তো লাগে।

: আপনের লাগলে আপনে যান।

মতি মিয়া উঠে বসার চেষ্টা করে। ফরিদ শুয়ে আছে তার গা ঘেঁষে। সে অন্য রকম একটা উত্তেজনা অনুভব করে। তার চেঁচিয়ে তর্ক করতে ইচ্ছা করে—বুঝলা ফরিদের মা, আমার হক আছে। আমার ছেলে মরে নাই যুদ্ধে ? কও তুমি যুদ্ধে মরে নাই ?

: হেতো কতই মরছে।

সবের হক আছে। বুঝলা ? কম্বল আমার হকের জিনিস।

ফুলজান হাই তুলে কুপী হাতে রান্না ঘরে ঢুকল। বাতি নিভে গিয়ে চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল। রাত কতটা বাকি কে জানে ? মতি মিয়ার প্রস্রাবের চাপ হয়েছে। শীতের মধ্যে উঠতে ইচ্ছা হচ্ছে না। প্রস্রাবের বেগ এমন এক জিনিস যা ক্ষিধের মত হু হু করে বাড়তে থাকে।

: ফরিদ ঘুমাইছস ?

: হু।

: ঘুমাইলে কথা কস ক্যামনেরে ছাগল ?

ফরিদ খুক খুক করে হাসে। মতি মিয়াও হাসে। বড় ভাল লাগে তার। বড় মায়া লাগে।

: কাইল কম্বল আনতে যামু বুঝলি ফরিদ ?

: আইচ্ছা।

: তুইও যাইবি আমার সাথে। হকের কম্বল। ঠিক না ?

: হ।

: ফরিদ ঘুমাইছস ?

: ঘুমাইছি।

: পেসাব করন দরকার।

মতি মিয়া চিন্তিত হয়ে পড়ে। এই প্রচণ্ড শীতে উঠা সম্ভব না। কিন্তু ইতিমধ্যে তলপেটে ব্যথা শুরু হয়েছে। মাবুদে এলাহী, বুড়ো হওয়ার বড় কষ্ট।

: ফরিদ ঘুমাইছস ?

ফরিদ জবাব দেয় না। ঘুমিয়ে পড়েছে বোধহয়। মতি মিয়া ঘুমন্ত ফরিদের সঙ্গেই কথা বার্তা চালাতে থাকে। কথা বার্তায় ব্যস্ত থাকলে মনটা অন্য দিকে থাকে তলপেটের চাপের কথাটা মনে থাকে না।

: বুঝলি ফরিদ, কাইল যামু রশীদ সাবের কাছে। তোর বাপের নাম কইলে না দিয়া উপায় নাই। বুঝছস ? তুইও যাইবি আমার

সাথে। চুপ কইরা বইসা থাকবি। ফাইজলামী বাদরামী করলে চড় খাইবি। বুঝছস···মতি মিয়া অনবরত কথা বলতে থাকে। কথা বলতে বড় ভাল লাগে তার। সকালটা শুরু হয়েছে খুব চমৎকার ভাবে। চনমনে রোদ উঠেছে। কুয়াশার চিহ্নমাত্র নেই। কে বলবে মাঘ মাসের সকাল। মতি মিয়া আয়েশ করে রোদে বসে আছে। বড় আরাম লাগছে।

ফুলজান ফরিদকে টিনের থালায় মুড়ি দিয়ে বসিয়ে দিয়েছে। এটা একটা ভাল লক্ষণ। এর মানে হচ্ছে ঘরে পান্তা নেই। যেদিন পান্তা থাকে না সেদিন দুপুরে ফরিদের মা গরম ভাতের ব্যবস্থা করে। আজও করবে। দুই এক গাল মুড়ি খেলে হত। ফরিদ থালা নিয়ে ঘুরছে দূরে দূরে। মুড়ি শেষ না হওয়া পর্যন্ত কাছে ভিড়বে না। মতি মিয়া ডাকল, 'ওই ফরিদ, ওই। এদিকে আয় দাদা।' ফরিদ না শোনার ভান করল। মহা বজ্জাত হয়েছে ছোকড়া।

ফুলজান দারোগা বাড়ি যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছে। দুপুর বেলা মনে করে এলে হয়। আসবে ঠিকই মায়া মহব্বত আছে মেয়েটার। ভাল মেয়ে।

: দারোগা বাড়ি যাও নাকি গো মা ?

: হু।

: আইচ্ছা ঠিক আছে। যাও। রইদটা একটু তেজী হউক, আমিও যাইতাছি রশীদ সাবের কাছে।

ফুলজান কোন জবাব দিল না। মতি মিয়া ইতস্ততঃ করে বলেই ফেলল, 'চিড়া মুড়ি কিছু আছে ? শইলডা যেন কেমুন কেমুন লাগে।'

: চিড়া মুড়ি কিছু নাই।

: ঠিক আছে। অসুবিধা নাই। তুমি যাও।

রোদটা আরামের যে উঠে দাঁড়াতে পর্যন্ত ইচ্ছা হয়না। তবু মতি মিয়া উঠল। রশীদ সাবের কাছে যাওয়া দরকার। মতি মিয়ার মন বলছে আজ গেলে কিছু একটা হবে। না হয়েই পারে না।

: আয়রে ফরিদ।

ফরিদ তার থালার মুড়ির শেষ দানাটি মুখে ফেলে দাদার হাত ধরল। চিকন গলায় বলল, 'কোলে নাও।' কাউকে কোলে নেবার বয়স কি আছে মতি মিয়ার ? তবু সে ফরিদকে কোলে নিল। কিছু দূর নিয়ে নামিয়ে দিলেই হবে। পুলাপান মানুষ একটা শখ হয়েছে।

রশীদ সাহেব সোহাগীর সি ও রেভিন্যু।

লোকটি ছোট খাট। তাঁকে দেখেই মনে হয় সবার উপর বিরক্ত হয়ে আছেন। ভুরু না কুঁচকে তিনি কারো দিকে তাকাতে পারেন না। কম্বলের প্রসঙ্গে তাঁর কোন ভাবান্তর হল না। তিনি অফিসের উঠোনে একটা চেয়ারে বসে চা খাচ্ছিলেন। চায়ের কাপ থেকে দৃষ্টি সরালেন না। মতি মিয়া দ্বিতীয়বার বলল, 'শীতে বড় কষ্ট পাইতাছি।' রশীদ সাহেব সে কথারও কোন জবাব দিলেন না। শুকনো চোখে তাকিয়ে রইলেন। মতি মিয়া ভেবে পেল না কথা-গুলি কি ভাবে বললে শীতের কষ্টটা পরিষ্কার বোঝা যাবে। রশীদ সাহেব কম্বলের প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে এলেন, নিরাসক্ত গলায় বললেন, 'এই ছেলে কে ?'

ঃ জ্বি, আমার নাতি। মেছের আলির ছেলে।

ঃ কার ছেলে ?

ঃ মেছের আলির। মেছের আলিরে চিনলেন না ? যুদ্ধ করল যে মেছের আলি।

রশীদ সাহেব বিরক্ত ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন। তিনি চিনেছেন। মতি মিয়ার মন খারাপ হয়ে গেল। এই লোকটা বিরক্ত হচ্ছে কেন ? তার ছেলের কথায় বিরক্ত হওয়ার কি আছে ?

গত বৎসর রিলিফের গম এল। মতি মিয়া গম আনতে গিয়ে বলল, 'চিনছেনতো আমারে ? আমি মেছের আলির বাপ। যুদ্ধ করতে গিয়ে মারা গেল সে মেছের আলি।' চ্যাংড়া মত একটি অপরিচিত ছেলে গম দিচ্ছিল। সে চোখ মুখ শক্ত করে বলল, 'মেছের আলির জন্যেও গম দেয়া লাগবে ? সেও রুটি খাবে ?' লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা সবাই হেসে উঠল। যেন এ রকম মজার কথা তারা বহু দিন শুনে নাই।

রশীদ সাহেব বিরক্ত হচ্ছেন। কিংবা কে জানে হয়ত রেগেও যাচ্ছেন। অফিসার মানুষ রেগে গেলে প্রথম দিকে বোঝা যায় না। তারা রাগ চেপে রাখেন। চেচাঁমেচি হৈ চৈ শুরু করে ছোট লোকেরা। মতি মিয়ার মত মানুষরা।

মতি মিয়া গলা পরিষ্কার করে বলল, 'জবর যুদ্ধ করেছিল মেছের আলি। নীলগঞ্জে একটা সড়কের তার নাম দিছে, 'শহীদ মেছের আলি সড়ক'। নীলগঞ্জ হইল গিয়া আপনার এইখান থাইক্যা...'

চিনি, নীলগঞ্জ কোথায় চিনি।

রশীদ সাহেব ভুরু কুঁচকালেন। মতি মিয়া চুপ করে গেল। বেলা অনেক হয়েছে। পেটের ক্ষিধে জানান দিচ্ছে। মুখ ভতি করে থুথু জমা হচ্ছে। রশীদ সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। নির্লিপ্ত গলায় বললেন, 'দাঁড়ান আপনি, একটা কম্বলের ব্যবস্থা করছি। চা খাবেন ?'

মতি মিয়ার চোখে পানি এসে গেল। বলে কি এই লোক ? মতি মিয়া চোখ মুছল। ধরা গলায় বলল, 'গত বৎসর বড় কষ্ট করেছি জনাব। দানা পানি নাই। শেষে ফরিদের মা কইল,—বুধবারের বাজারে একটা থালা লইয়া বসেন। বসলাম গিয়া। নিজ গেরামের বাজারে ভিক্ষা করা শরমের কথা। বড় শরমের মধ্যে পড়েছিলাম জনাব।'

মতি মিয়া ক্রমাগত চোখ মুছতে লাগল। ফরিদ তাকিয়ে আছে। সে বড়ই অবাক হয়েছে।

রশীদ সাহেব শুধু যে কম্বল দিয়েছেন তাই না পঞ্চাশটি টাকাও দিয়েছেন। সেই টাকার খানিকটা ভাঙ্গিয়ে মতি মিয়া চা ও চিনি কিনে ফেলল। ফরিদকে বলল, 'বুড়াকালে চা টা খুব দরকার। বুকে কফ জমেনা। ভাল ঘুম হয়। বুঝলিরে বেকুব। বুড়াকালে চা হইল গিয়া অষুধ।' তারা দু'জন সাড়া দুপুর বাজারে ঘুরল। মতি মিয়া পরিচিত সবাইকেই নতুন কম্বল দেখাল। তার গলা ভতি হাসি, মেছের আলির কারণে পাইলাম, বুঝলা না ? মেছেরের নাম কইতেই মন্ত্রের মত কাম হইল। বিলাতী জিনিশ হাত দিয়া দেখ। জবর ওম। চাইর পাঁচ শ টেকা দাম হইব, কি কও ?'

মতি মিয়ার মনে ক্ষীণ আশংকা ছিল ফরিদের মা কম্বলটা হয়ত নিজের জন্যে দাবি করবে। মেছের আলির কম্বলে ওদের দাবিইতো বেশী। কিন্তু তা সে করল না। চকচকে নতুন কম্বলের প্রতি তার কোন রকম আগ্রহ দেখা গেল না। সে যথারীতি ফরিদকে নিয়ে রান্নাঘরে ঘুমুতে গেল।

দীর্ঘদিন পর আরাম করে ঘুমুতে গেল মতি মিয়া। এত আরাম যে চট করে ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছা হয় না। জেগে গল্প করতে ইচ্ছা হয়।

: ফরিদের মা, ঘুমাইলা নাকি ?

: না।

: জবর ওম কম্বলটার মইধ্যে। বিলাতী জিনিশতো। বিলাতী জিনিশের ওম অন্য রকম। ভাল ঘুম হইব।

: ঘুমান ভাল কইরা।

: ফরিদের মা।

: কন কি।

: মেছেরের কথা কইতেই রশীদ সাব খুব ইজ্জত করল। চা খাওয়াইল। শরীফ আদমী। খুব শরীফ আদমী।

ফুলজান জবাব দিল না। মতি মিয়া বলল, 'ফরিদরে দিয়া যাও, আমার সাথে বাপের কম্বলের নীচে ঘুমাউক।' ফুলজান সে কথারও জবাব দিল না। ঘুমিয়ে পড়েছে নাকি ?

গভীর তৃপ্তিতে ঘুমুবার আয়োজন করল মতি মিয়া। ছেলের প্রতি গাঢ় কৃতজ্ঞতায় তার মন ভরে যাচ্ছে। বড় শান্তি লাগছে। ঘুমের মধ্যেই সে শুনলো, ফুলজান কাঁদছে। সে প্রায়ই কাঁদে। তার কান্না শুনতে মতি মিয়ার কোন কালেই ভাল লাগে না। কিন্তু আজ ভালই লাগছে—কেমন যেন গানের সুরের মত সুর।

আরাম করে ঘুমায় মতি মিয়া। বাইরে প্রচণ্ড শীত। ঘন হয়ে কুয়াশা পড়ছে। উত্তর দিক থেকে বইছে ঠাণ্ডা হিমেল হাওয়া।

সুখ অসুখ

খুট খুট শব্দ হচ্ছে সিঁড়িতে।

সুরমা আসছে। দশটা বেজে গেল নাকি ? রহমান সাহেব দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকালেন। তাকাতে কষ্ট হয়। ঘাড় অনেকখানি বাঁকা করতে হয়। না দশটা বাজেনি এখনো দশ মিনিট বাকি আছে। সুরমা আজ সকাল সকাল চলে আসছে কেন ? তার সব কাজতো ঘড়ি ধরা। রহমান সাহেব বিস্ময় বোধ করলেন।

: বাবা, কিছু লাগবে।

রহমান সাহেব, উত্তর দেবার আগে সুরমার মনের ভাব বুঝতে চেষ্টা করলেন। কিছু কিছু মুখ আছে যেখানে মনের কোন ছাপ পড়ে না। রহমান সাহেব সুরমার মুখের দিকে তাকিয়ে কোনদিনই কিছু বুঝতে পারেন নি। আজও পারলেন না। সুরমা দ্বিতীয় বার বললো, 'কিছু লাগবে আপনার ?'

: না বৌমা। কিছু লাগবে না।

: দুধ খেয়েছেন ?

: হু।

: তোতা মিয়া আপনাকে বাথরুম করিয়ে গেছে ?

এই প্রশ্নটি সুরমা প্রতিরাতেই এসে জিজ্ঞেস করে এবং প্রতি রাতেই তিনি দারুণ লজ্জিত বোধ করেন। আজও হ্যাঁ বলতে গিয়ে গলায় কথা আটকে গেলো।

: আবার যদি বাথরুমের দরকার হয় তাহলে তোতা মিয়াকে ডাকবেন। কলিং বেলটা টেপেন।

: না দরকার নাই।

: বাতি নিভিয়ে দেই ?

: দাও।

সুরমা বাতি নিভিয়ে দিল। ঘর অবশ্যি অন্ধকার হল না সুরমা জিরো পাওয়ারের টেবিল ল্যাম্পটি জ্বালালো। এই কাজ দু'টি শুয়ে শুয়ে রহমান সাহেব নিজেও করতে পারেন। তাঁর হাতের কাছে বেড সুইচ আছে। প্যারালাইসিস হবার পর থেকে শেষ বাতি নেভানোর জন্যে সুরমা আসছে। তিনি এই বাড়তি যত্নটুকু পাচ্ছেন। বড় ভাল মেয়ে।

বাতি নেভাবার পরও সুরমা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। সে কি কিছু বলতে চায়? রহমান সাহেব উঠে বসার চেষ্টা করলেন পারলেন না। তিনি যে এখন আর ইচ্ছামত উঠে বসতে পারেন না। তিনি মৃদু স্বরে বললেন, 'বৌমা, লিলি কি ঘুমিয়ে পড়েছে?'

: হ্যাঁ। ও নয়টার সময় ঘুমুতে যায়।

: তুমি কি কিছু বলবে?

: না কিছু বলব না। আপনি ঘুমান। মাথার পাশের জানালাটা বন্ধ করে দেই? শেষ রাতের দিকে ঠাণ্ডা পড়ে।

: দাও।

: আপনার পায়ের কাছে চাদর আছে। ঠাণ্ডা লাগলেই চাদর টেনে দেবেন।

: ঠিক আছে।

: আর কোন রকম দরকার হলেই তোতা মিয়াকে বলবেন, আমাকে ডেকে তুলতে।

: ঠিক আছে মা বলব।

: সুরমা ঘর থেকে বেরিয়ে দরজা ভিজিয়ে নিচে নেমে গেলো। রহমান সাহেব মনে করার চেষ্টা করলেন—সুরমার চোখে মুখে ঠিক কি পরিমাণ ঘৃণা ছিল? ভাল মেয়েদের মধ্যেও ঘৃণা থাকতে পারে এবং থাকে।

বালিশের নিচ থেকে তিনি সিগারেটের প্যাকেট বের করলেন। হাত দু'টি সচল আছে। সিগারেট ধরাতে কোন অসুবিধা হয় না। ভাগ্যিস কোমরের নীচ থেকে প্যারালিসিস হয়েছে।

সিগারেটে টান দিয়ে নিজের মনে তিনি খানিকক্ষণ হাসলেন। মনে মনে বললেন—আমার খুব ভাল এবং খুব লক্ষ্মী বৌমাকে আমি প্যাঁচে ফেলেছি। আমাকে এই অবস্থায় ফেলে তার কোথাও যাবার উপায় নেই। এই খানেই তাকে থাকতে হবে।

আফজল নিশ্চয়ই নর্থ ডাকোটা থেকে প্রতি সপ্তাহেই লিখছে—সুরমা, বাবাকে এই অবস্থায় দেশে ফেলে তোমাদের আমেরিকায় আসার প্রশ্নই উঠে না। কাজেই তোমরা আর কিছুদিন অপেক্ষা কর। বাবার শরীর সুস্থ হোক। বাবার শরীর না সারা পর্যন্ত এই নিয়ে আর কিছুই করা যাবে না……।

রহমান সাহেব অন্ধকারেই হাসলেন—এটা সুস্থ হবার অসুখ না। রহমান সাহেব খাটের কাছে লাগানো সুইচ টিপলেন। দু'বার টেপার সঙ্গে সঙ্গেই তোতা মিয়া বিরক্ত মুখে ঢুকলো।

: বেড প্যান দাও। পেসাব করব।

তোতা মিয়া বাতি জ্বালালো। তার মুখ অন্ধকার। হারামজাদা নবাব বেড প্যান দিতে তার কষ্ট হচ্ছে? মুখ একেবারে আঁধার হয়ে গেলো।

তোতা মিয়া শুকনো গলায় বললো—সিগারেট খাইতে আম্মা নিষেধ করছে না।

: চুপ থাক তুই।

: আম্মা আমরারে গাইল মন্দ করে।

: করলে করুক। তুই টেবিল ল্যাম্পটা মাথার কাছে দিয়ে যা।

: এত রাইতে টেবিল ল্যাম্প দিয়া কি করবেন।

: যাই করি। তোকে দিতে বলছি দে।

তোতা মিয়া টেবিল ল্যাম্প এগিয়ে আনলো। রাত এগারোটার দিকে তিনি চিঠি লিখতে বসলেন। রাতজাগার রুটিন তার নতুন নয়। সুরমা বাতি নিভিয়ে দেবার পর পরই তিনি বাতি জ্বালেন প্রায় দিনই দেড়টা দু'টা পর্যন্ত জাগেন। এই বয়সে ঘুম কমে যায়। শুধু জেগে থাকতে ইচ্ছা করে।

রহমান সাহেবের হাতের লেখা পরিষ্কার। তিনি গোটা গোটা হরফে লিখলেন—প্রিয় আফজল, আমার শরীর ক্রমশই খারাপ হইতেছে। এখন আর কিছুই ভাল লাগে না। রাতদিন পাক পারওয়ারদেগারের কাছে প্রার্থনা করি যাতে তিনি আমাকে তোমার মা'র কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেন। আমার কারণে বৌমার যাওয়া স্থগিত আছে মনে হইলে অত্যন্ত কষ্ট বোধ করি। লিলির দিকে তাকাইলে চোখে পানি আসে। বাবা তোমার প্রতি আমার আদেশ তুমি আমার কথা চিন্তা না করিয়া বৌমাকে নিজের কাছে নেওয়ার ব্যবস্থা করো। এইখানে একা একা থাকিতে আমার কোন অসুবিধা হইবে না। ইনশাআল্লাহ্। তোতা মিয়া আছে। মনোয়ারের মা আছে। পাশের বাড়ির ডাক্তার সাহেব আছেন। তুমি বাবা, আমার জন্যে চিন্তা করিবে না। আমার কোনই অসুবিধা নাই।...”

চিঠিটা প্রায় তিন পৃষ্ঠা হলো। অসুখের পর রহমান সাহেব ছোট চিঠি লিখতে পারেন না। চিঠি লম্বাই হতে থাকে। শুধু লিখতেই ইচ্ছা করে।

রহমান সাহেব চিঠি শেষ করে বাতি নেভালেন। ঘুম ঘুম ভাব আসছে। ঘণ্টা খানিকের মধ্যে ঘুম হয়তো এসে যাবে। তিনি ভাবতে লাগলেন—আফজল চিঠির জবাবে কি লিখবে। সে নিশ্চয়ই রেগে মেগে লিখবে—“কি করে আপনি ভাবলেন আপনার বৌমা আপনাকে ফেলে আমার কাছে আসবে? এ রকম চিন্তা করাই বাতুলতা। এ নিয়ে আপনি মাথা ঘামাবেন না। আমি খুব শিগগীরই দেশে এসে আপনাকে দেখে যাব।”

রহমান সাহেব আবার কলিং বেল টিপলেন। বৌমা এই বুদ্ধিটি ভাল করেছে। খাটের সঙ্গে সুইচ লাগিয়ে দিয়েছে। তোতা মিয়াকে আনবার জন্যে বেশ কয়েকবার সুইচ টিপতে হলো। হারামজাদা নবাব বারোটা বাজতেই ঘুম। তাকে রাখাই হয়েছে রুগী দেখা শোনার জন্যে। রহমান সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন—বেড প্যান দে।

: আবার।

: হ্যাঁ আবার।

তোতা মিয়া বেড প্যান দিল। খাবার পানি দিল। টেবিল ল্যাম্প সরিয়ে রাখল। মাথার কাছের যে জানালাটা বন্ধ করা হয়েছিল সেটি খুলল। রহমান সাহেবের ফরমায়েশ তখনো শেষ হল না। তিনি হঠাৎ বললেন—পান বানিয়ে আন। পান খাব।

: পানতো ঘরে নাই। এই বাড়িতে পানতো কেউ খায় না।

: খায় না কি রে ব্যাটা? আমি খাই না? আমিতো খাই যা আন।

: কোথাইকা আনমু?

: দোকান থেকে আন।

: এই দুপুর রাইতে?

: হ্যাঁ।

: দোকানতো সব বন্ধ।

: চুপ বেটা বেশী কথা বলে। ঢাকা শহরে বারটার সময় পানের দোকান বন্ধ হয়? আবার মুখে মুখে কথা।

: অখন গেট খুললে আম্মার ঘুম ভাঙ্গব।

: আর একটি কথা বললে চড় খাবি। পান নিয়ে আসতে বলেছি নিয়ে আয়।

তোতা মিয়া পান আনতে যায় এবং ইচ্ছা করেই গেটে ঝন ঝন শব্দ করতে থাকে। দোতলা থেকে রহমান সাহেব গেটের ঝনঝনানি শুনতে পান। এবং তার খানিকক্ষণ পরই সিঁড়িতে খুট খুট শব্দ হয়। সুরমা উঠে আসছে। রহমান সাহেব চোখ বন্ধ করে বালিশে মাথা এলিয়ে দেন।

: কি হয়েছে বাবা।

: কিছু হয় নাই মা। বমি বমি লাগছে। তোতামিয়াকে পান আনতে পাঠিয়েছি। বড় খারাপ লাগছে মা।

রহমান সাহেব ওয়াক করে বমির একটা ভঙ্গি করেন।

: আপনি এখনো ঘুমান নাই।

: ঘুমিয়েছিলাম। একটা স্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙ্গলো। তোমার শাশুরীকে স্বপ্নে দেখলাম। পরিষ্কার দেখলাম হাত ইশারা করে

আমাকে ডাকছে। মরা মানুষের হাত ইশারা করে ডাকার স্বপ্ন খুব খারাপ।

রহমান সাহেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন সুরমার দিকে। সুরমাকে দেখে মনে হচ্ছে না সে বিশ্বাস করছে। ভাবলেশহীন দৃষ্টি। এই মেয়ে তার বেশীর ভাগ কথাই বিশ্বাস করে না। রহমান সাহেব মনে মনে একটা কুৎসিত গাল দিলেন। সুরমা বললো ঘুমুতে চেষ্টা করেন। বাতি নিভিয়ে দেন।

: পান আনুক। পান খেয়ে নেই আগে।

সুরমা আর কোন কথা না বলে নীচে নেমে গেলো। রহমান সাহেব মনে মনে বললেন ··আদরের বৌমাকে আমি ভাল প্যাঁচে ফেলেছি। এখন যাও দেখি আমেরিকা? সবতো ঠিক ঠাক করা ছিল। বুড়ো শ্বশুর এখানে একা একা থেকে বাড়ি পাহারা দিবে। আর তোমরা মহা সুখে থাকবে আমেরিকা। সেখানে বাড়িটারিও কেনা হয়েছে। লেকের পাড়ে বাড়ি। উইক এণ্ডে লেকে ঘুরে বেড়ানোর জন্য স্পীড বোট পর্যন্ত কেনা হয়েছে। এখন ঘুরো দেখি স্পীড বোটে? এখন আর বুড়ো বাপের কথা মনে থাকে না? বুড়ো দেশে থেকে পঁচুক। কিছুই যায় আসে না। ছ'মাস দশ মাস পর পর একখানা চিঠি ছাড়লেই হবে···বাবা, তুমি কেমন আছ? তুমি একা একা দেশে পড়ে আছ ভাবতেই খুব কষ্ট হয় ··· ···।

তোতা মিয়া পান নিয়ে এলো।

রহমান সাহেব এক সঙ্গে দু'টো পান মুখে দিয়ে হৃষ্ট চিত্তে সিগারেট ধরালেন। ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন খুব কায়দা করে। মশারীর ভেতর সিগারেটের ধোঁয়া মেঘের মত জমে জমে যাচ্ছে বেশ লাগছে দেখতে।

তোতা মিয়া বললো, আর কিছু লাগব?

: না।

: পেসাব করবেন আরেকবার?

: না।

: ঘুমাইতে যাই?

: যা।

বেশ লাগছে তাঁর। তবে ঘুম চটে গেছে। বাকি রাতটা বোধ হয় জেগেই কাটাতে হবে। তিনি মনে মনে আফজলের কাছে দ্বিতীয় একটি চিঠি লিখতে শুরু করলেন। এই চিঠিটি তিনি আগামী সপ্তাহে পাঠাবেন। বাবা, শরীরের অবস্থা আরো খারাপ হইতেছে। বাঁচিয়া থাকা বড় কষ্ট। তবে আমার লক্ষ্মী বৌমা বড় যত্ন করিতেছে। আমার নিজের মেয়ে থাকিলে সেও এত কষ্ট করিত কি না সন্দেহ। আল্লাহ তার হায়াত দরাজ করুক। আমি আল্লাহর কাছে তার জন্যে খাস দিলে দোয়া করিতেছি।

ভাবতে ভাবতে রহমান সাহেব খুক খুক করে হাসলেন। ভাল প্যাঁচে আটকে দিয়েছি। প্যারালিসিস-এর রুগী সহজে মরে না। এরা শকুনের মত বেঁচে থাকে। আমিও থাকব। দেখি আমাকে ফেলে রেখে তোমরা যাও কোথায়?

রহমান সাহেবের ডান পায়ের পাতা চুলকাচ্ছে। কোন মতেই চুলকানো সম্ভব নয়। তাঁর বড় অস্বস্তি লাগছে। তিনি কলিংবেলের সুইচ টিপলেন। হারামজাদা তোতামিয়া আসছে না। ইচ্ছা করে আসছে না। জেগে মটকা মেরে পড়ে আছে। রহমান সাহেব টিপতেই থাকলেন।

খুট খুট শব্দ হচ্ছে সিঁড়িতে। সুরমা উঠে আসছে না কি? রহমান সাহেবের পায়ের চুলকানী সেরে গেলো।

: কি হয়েছে বাবা?

: পায়ের পাতা চুলকাচ্ছিল।

: কোন পায়ের পাতা?

: ডানটা।

সুরমা মশারী তুলে মাথা ভেতরে ঢুকালো। রহমান সাহেব দেখলেন তার ফর্সা হাত এগিয়ে আসছে পায়ের দিকে।

: চুলকাতে হবে না মা। এখন আর নাই। আহ কি ফর্সা হাত মেয়েটার।

: বাবা, এখন কি আরাম হয়েছে।

: হ্যাঁ তুমি যাও মা। আর লাগবে না।

সুরমা গেলো না। বিছানার পাশে বসলো। হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো পায়ে। রহমান সাহেব ক্ষীণ সুরে বললেন—বুঝলে বৌমা, তোমার সাথে তোমার শাশুরীর খুব মিল আছে।

সুরমা কিছু বললো না।

: বুঝলে সেও তোমার মত সুন্দর ছিল। তোমার মতই গায়ের রং।

রহমান সাহেবের হয়ত আরো কিছু বলার ইচ্ছা ছিল কিন্তু সুরমা উঠে দাঁড়ালো। মশারী গুজে দিয়ে হালকা সুরে বললো—মশারীর ভেতর সিগারেট খাবেন না বাবা হঠাৎ আগুন টাগুন ধরে যাবে।

: আচ্ছা আর খাব না।

: সিগারেট খাবার সময় কাউকে রাখবেন আশে পাশে। এখন কি আপনার সিগারেট খেতে ইচ্ছা হচ্ছে? ইচ্ছা হলে একটা খান আমি বসছি।

রহমান সাহেব যন্ত্রের মত বালিশের নীচ থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করলেন। সুরমা চেয়ারে বসলো। তার গায়ে হালকা নীল রঙের একটা শাড়ি। রহমান সাহেব মনে মনে বললেন - বড় সুন্দর মেয়ে তবে খুব অহংকারী। এত অহংকার ভাল না।

সুরমা তাকিয়ে আছে ঘড়ির দিকে। সময় দেখছে হয়ত। দেড়টা বাজে—অনেক রাত। এক সময় সে মৃদু স্বরে বললো—বাবা, বাইরের মানুষের সঙ্গে—কথা বার্তা সাবধান হয়ে বলা উচিত। কেউ পেটে কথা রাখে না। চারদিকে ছড়ায়।

: কাকে আমি কি বললাম?

: ডাক্তার সাহেবকে আপনি বলেছেন—আপনার মনে সন্দেহ কোনদিন না কোনদিন আমি বিষ টিষ খাইয়ে আপনাকে মেরে ফেলব। এসব বলা ঠিক না।

: ঠাট্টা করে বলেছিলাম মা।

: ঠাট্টা করে বলাও ঠিক না। সবাইতো আর ঠাট্টা বুঝতে পারে না।

সুরমা বসে আছে শান্ত ভঙ্গিতে। তার মুখে মনের ছাপ পড়ে না। রহমান সাহেবের ইচ্ছা হল জ্বলন্ত সিগারেট হাত থেকে বিছানায় ফেলে দেন। আগুন জ্বলে উঠুক। মেয়েটি দেখুক তাকিয়ে তাকিয়ে।

কিন্তু তার সাহস হয় না। তাঁর বড় বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করে।

রহস্য

রহস্য জাতীয় ব্যাপারগুলিতে আমার তেমন বিশ্বাস নেই। তবু প্রায়ই এ রকম কিছু গল্প-টল্প শুনতে হয়। গত মাসে ঝিকাতলার এক ভদ্রলোক আমাকে এসে বললেন, তার ঘরে একটি তক্ষক আছে —সেটি রোজ রাত ১টা ২৫ মিনিটে তিনবার ডাকে। আমি বহু কষ্টে হাসি থামালাম। এ রকম সময়নিষ্ঠ তক্ষক আছে নাকি এ যুগে? ভদ্রলোক আমার নির্বিকার ভঙ্গি দেখে বললেন, কি ভাই বিশ্বাস করলেন না?

: জ্বি না।

: এক রাত থাকেন আমার বাসায় নিজের চোখে দেখেন তক্ষকটা। ঘড়ি ধরে বসে থাকবেন। দেখবেন ঠিক ১টা ২৫ মিনিটে তিনবার ডাকবে।

: আরে দুর কি যে বলেন।

ভদ্রলোক মুখ কালো করে উঠে গেলেন। চারদিন পর তাঁর সঙ্গে আবার দেখা। পৃথিবীটা এ রকম যার সঙ্গে দেখা হবার তার সঙ্গে দেখা হয় না। ভুল মানুষের সঙ্গে দেখা হয়। আমাকে দেখেই ভদ্রলোক গম্ভীর মুখে বললেন, আপনি কি দৈনিক বাংলার সালেহ সাহেবকে চেনেন?

: হ্যাঁ চিনি।

: তাঁকে বাসায় নিয়ে গিয়েছিলাম। তিনি নিজের কানে শুনেছেন। বলেছেন একটা নিউজ করবেন।

: ভালই তো নিউজ হবার মতই খবর।

: আপনি আসেন না ভাই থাকেন এক রাত।

: আমাকে শোনালে কি হবে?

: আরে ভাই আপনারা ইউনিভার্সিটির টিচার। আপনাদের কথার একটা আলাদা দাম।

: তাই নাকি?

: আপনারা একটা কথা বললে কেউ ফেলবে না।

: এই জিনিসটা নিয়ে খুব হৈ-চৈ করছেন মনে হচ্ছে।

: না, হৈ-চৈ কোথায়? অনেকেই অবশ্যি শুনে গেছেন। বাংলাদেশ টিভির ক্যামেরাম্যান নজমুল হুদাকে চেনেন?

: জ্বি না।

: উনিও এসেছিলেন। খুব মাইডিয়ার লোক। আপনি আসুন না।

: আচ্ছা ঠিক আছ, একদিন যাওয়া যাবে।

: ভদ্রলোকের চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি মুখভর্তি করে হাসলেন। টেনে-টেনে বললেন, চলেন চা খাই।

: না, চা খাব না।

: আরে ভাই আসেন না। প্রফেসর মানুষ, আপনাদের সঙ্গে থাকাটা ভাগ্যের ব্যাপার।

ভদ্রলোক হা-হা করে হাসতে লাগলেন। যেতে হল চায়ের দোকানে।

: চায়ের সঙ্গে আর কিছু খাবেন? চপ?

: না।

: আরে ভাই খান না। এই এদিকে দু'টো চপ দে তো। এখন ভাই বলেন, কবে যাবেন।

: আপনার সঙ্গে তো প্রায়ই দেখা হয়, বলে দেব একদিন।

চা খেতে-খেতে ভদ্রলোক দ্বিতীয় একটি রহস্যের কথা শুরু করলেন। নাইনটিন সিক্সটিতে তিনি বরিশালের পিরোজপুরে থাকতেন। তার বাসার কাছে একটা বড় কাঁঠাল গাছ ছিল। অমাবস্যার রাতে নাকি সেই কাঁঠাল গাছ থেকে কান্নার শব্দ ভেসে আসত। আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, সেই কান্নারও কি কোন টাইম ছিল? নির্দিষ্ট সময়ে কাঁদত? আপনার তক্ষকের মত?

ভদ্রলোক আহত স্বরে বললেন, আমার কথা বিশ্বাস করলেন না?

: বিশ্বাস করব না কেন ?

: আমি কান্নার শব্দ গোটাটা টেপ করে রেখেছি। একদিন শোনাব আপনাকে।

: ঠিক আছে।

বরিশালের ডিসি সাহেবও শুনেছেন। চেনেন উনাকে ? আসগর সাহেব। সি এস পি। খুব খান্দানী ফ্যামিলি।

: না, চিনি না।

: ডিসি সাহেবের এক ভাই আছেন বাংলাদেশ ব্যাংকে। বিরাট অফিসার।

: তাই বুঝি ?

: জ্বি। উনার বাসায় একদিন গিয়েছিলাম। খুব খাতির-যত্ন করলেন। গুলশানে বাসা। তিন তলা। উনি থাকেন এক তলায়। ওপরের দু'টো তলা ভাড়া দিয়েছেন।

ভদ্রলোক আমার প্রায় এক ঘণ্টা সময় নষ্ট করে বিদায় হলেন। আমার মায়াই লাগলো। ইণ্ডেনটিং ফার্মে সামান্য একটা চাকরি করেন। দেখেই বুঝা যায় অভাবে পর্যুদস্ত। চোখের দৃষ্টি ভরসা-হারা। বয়স এখনো হয়ত ত্রিশ হয়নি কিন্তু বুড়োটে দেখায়। বিচিত্র চরিত্র।

মাস খানেক তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হল না। তার প্রধান কারণ, যে সব জায়গায় তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হবার সম্ভাবনা সে সব জায়গা আমি এড়িয়ে চলতে শুরু করেছি। নিউমার্কেটে আড্ডার জায়গাটিতে যাই না। কি দরকার ঝামেলা বাড়িয়ে ? এই লোকটি পিচ্ছিল পদার্থ, সে গায়ের সঙ্গে সেঁটে যাবে। আর দাঁড়ানো যাবে না। কিন্তু তবু দেখা হল। একদিন শুনলাম সে ইউনিভার্সিটি ক্লাবে এসে খোঁজ নিচ্ছে। ক্লাবের বেয়ারা বললো, গত কিছুদিন ধরে নাকি সে নিয়মিতই আসছে। কি মুসিবত।

একদিন আর এড়ানো গেল না। ভদ্রলোক বাসায় এসে হাজির।

: কি ভাই আপনি তো আর এলেন না।

: কাজের ব্যস্ততা···

: আজকে আপনাকে নিতে এসেছি।

: সে কি ?

: কবি শামসুল আলম সাহেবও আসবেন।

: তাই বুঝি ?

: জ্বি। চিনেনতো শামসুল আলম সাহেব কে ? দু'টো কবিতার বই বেরিয়েছে। 'পাখির পালক' আর 'অন্ধকার জ্যোৎস্না'।

: তাই বুঝি ?

: জ্বি। আমাকে দু'টো বই-ই দিয়েছেন। খুবই বন্ধুমানুষ। বাড়ি হচ্ছে আপনার ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা।

: ও।

: উনার ছোট ভাইও গল্প টল্প লেখেন। আরিফুল আলম।

গেলাম তাঁর বাসায়। ঝিকাতলার এক গলিতে ঘুপসি মত দু'কামরার বাড়ি। মেজাজ খুবই খারাপ। রাত দেড়টা পর্যন্ত বসে থাকতে হবে সময়নিষ্ঠ তক্ষকের ডাক শোনার জন্যে। কত রকম যন্ত্রণা যে আছে পৃথিবীতে !

ভদ্রলোক আমাকে বসার ঘরে বসিয়ে অতি ব্যস্ততার সঙ্গে ভেতরে চলে গেলেন। বসার ঘরটি সুন্দর করে সাজানো। মহিলার হাতের সযত্ন স্পর্শ আছে। ভদ্রলোক বিবাহিত জানতাম না। এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে কখনো কথা হয়নি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তার স্ত্রী ঘরে এসে ঢুকলেন। খুবই অল্প বয়েসী তরুণী এবং অসম্ভব রূপসী। আমি প্রায় হকচকিয়ে গেলাম।

: আমার স্ত্রী লীনা। আর লীনা, উনি হুমায়ুন আহমেদ। এর কথাতো তোমাকে বলেছি।

লীনা হাসি মুখে বললো, জ্বি আপনার কথা প্রায়ই বলে।

: লীনা একটু চায়ের ব্যবস্থা কর।

লীনা চলে গেল ভেতরে। ভদ্রলোক নিচু গলায় বললেন, লীনার গল্প-উপন্যাস লেখার শখ আছে। কয়েক দিন আগে সাপ

নিয়ে একটা গল্প লিখেছে। মারাত্মক গল্প ভাই। আপনাকে পড়ে শোনাতে বলবো। আমি বললে পড়বে না। আপনিও কাইণ্ডলি একটু বলবেন।

আমি বললাম, গুণী মহিলাতো।

ভদ্রলোকের চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

: তা ভাই, কথাটা অস্বীকার করব না। গানও জানে। নজরুল-গীতি। ভাল গায়। বাড়িতে টিচার রেখে শিখেছে।

: তাই নাকি?

: জ্বি, শোনাবে আপনাকে। একটু প্রেসার দিতে হবে আর কি। আপনি একটু রিকোয়েস্ট করলেই শোনাবে। কাইণ্ডলি একটু রিকোয়েস্ট করবেন।

: ঠিক আছে, করব।

চা এসে পড়লো। চায়ের সঙ্গে বড়া জাতীয় জিনিস। বেশ খেতে। আমি বললাম, কিসের বড়া এগুলি? ডালের নাকি?

ভদ্রলোক উচ্চস্বরে হাসলেন, নারে ভাই, কুলের বড়া। হা-হা-হা। কত রকম অদ্ভুত রান্না যে জানে। মাঝে-মাঝে এত সারপ্রাইজ হই। খেতে কেমন হয়েছে বলেন? চমৎকার না?

: ভাল, বেশ ভাল।

: আরেক দিন আসবেন, চাইনীজ স্যুপ খাওয়াবো। চিকেন কর্ন স্যুপ। চাইনীজ-রেস্তোরাঁর চেয়ে যদি ভাল না হয় তাহলে কান কেটে ফেলবেন। হা-হা-হা।

আমি মেয়েটির লেখা একটি ছোট গল্প শুনলাম, ছ'টি কবিতা শুনলাম। তিনটি নজরুলগীতি শুনলাম। ভদ্রলোক মুগ্ধ ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইলেন। বার-বার বললেন, ইস্ শামসুল আলম সাহেব আসলেন না। দারুণ মিস্ করলেন, কি বলেন ভাই?

রাত এগারোটার দিকে বললাম, তা হলে আজ উঠি?

: তক্ষকের ডাক শুনবেন না?

: আরেক দিন শুনব।

: আচ্ছা, ঠিক আছে। ভুলবেন না যেন ভাই। আসতেই হবে।

ভদ্রলোক আমাকে এগিয়ে দিতে এলেন। রাস্তায় নেমেই বললেন, আমার স্ত্রীকে কেমন দেখলেন ভাই?

: ভাল গুণী মহিলা।

ভদ্রলোকের চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। ধরা গলায় বললেন, বাঁদরের গলায় মুক্তার মালা। ঠিক না ভাই?

আমি কিছু বললাম না। ভদ্রলোক কাঁপা গলায় বললেন, গরীব মানুষ, স্ত্রীর জন্যে কিছুই করতে পারি না কিন্তু এই সব নিয়ে লীনা মোটেই মাথা ঘামায় না। বড় ফ্যামিলির মেয়েতো। ওদের চাল চলনই অন্য রকম।

আমি রিকশায় উঠতে উঠতে বললাম, খুব ভাগ্যবান আপনি।

ভদ্রলোক আমার হাত চেপে ধরলেন। যেন আবেগে কেঁদে ফেলবেন।

: ভাই, আরেকদিন কিন্তু আসতে হবে। তক্ষকের ডাক শুনতে হবে। আসবেনতো? প্লীজ।

তক্ষকের ডাকের মত কত রহস্যময় ব্যাপারইনা আছে পৃথিবীতে।

অপরাহ্ণ

রিকশাওয়ালাটাকে ইসহাক সাহেবের পছন্দ হল না।

কেমন উদ্ধত ভাবভঙ্গি। ঘামে ভেজা চকচকে মুখ। ঘাড় পর্যন্ত লম্বা চুল। দেখেই মনে হচ্ছে এ নির্বিকার ভঙ্গিতে ট্রাকের সামনে রিকশা নিয়ে চলে যাবে। লাল বাতির দিকে ফিরেও তাকাবে না এবং ভাড়া নিয়ে গণ্ডগোল করবে। ভাড়া দেয়ামাত্র তেড়িয়ে হয়ে বলবে—'সাত টেকা ঠিক কইরা পাঁচ টেকা দেন কেন?'

অবশ্যি এই লোক এ রকম নাও করতে পারে মানুষের চেহারা দেখে তার মনের ভাব টের পাওয়া কঠিন কাজ। কিন্তু এই লোকটির চুল লম্বা। লম্বা চুল মানেই একটা ফ্যাশানের ব্যাপার। একজন রিকশাওয়ালা যখন ফ্যাশন করে তখন বুঝতে হবে তার ভেতরে কোন ঝামেলা আছে।

ইসহাক সাহেব বললেন—'ঝিকাতলা কত নিবে?' রিকশাওয়ালা পিচ করে তার ঠিক সামনেই থুথু ফেলে বলল—'যা নায্য ভাড়া হয় দিবেন।'

: নায্য ভাড়াটা কত শুনি?

রিকশাওয়ালা বিরক্ত মুখে তাকাল। কোন উত্তর দিল না। পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে সে ঝামেলাটা করবে নায্য ভাড়া নিয়ে। যখন তাকে নায্য ভাড়া দেওয়া হবে সে থমথমে গলায় বলবে—'এইটা কি দিলেন?' এমন হৈ চৈ শুরু করবে যে চারদিকে লোক জমে যাবে।

ইসহাক সাহেব কঠিন স্বরে বললেন—'পাঁচ টাকা দেব—যাবে'? রিকশাওয়ালা হ্যাঁ না কিছুই বলল না। পিচ করে আবার থুথু ফেলল। মনে হচ্ছে তার যাবার ইচ্ছা নেই।

আকাশে জুন মাসের রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে আগে এই রোদে রাস্তার পিচ গলে যেত এখন গলে না। এরা বোধ হয় রাস্তায় নতুন ধরনের কোন পিচ ব্যবহার করে।

: কি যাবে নাকি?

: উঠেন।

পাঁচ টাকায় রাজি হওয়া একটা সন্দেহজনক ব্যাপার। এই কড়া রোদে ভাড়া পাঁচ টাকার বেশি হওয়া উচিত। কিন্তু এ ব্যাটা রাজি হয়ে গেল কেন? অন্য কোন মতলব আছে নাকি? একবার তিনি গুলিস্তান থেকে নিউমার্কেট যাবেন রিকশাওয়ালা তিন টাকায় রাজী হয়ে গেল। রহস্যটা টের পেলেন কিছুদূর যাবার পর। রিকশাওয়ালা বিরাট এক কাহিনী ফেঁদে বসল। যে কাহিনী বিশ্বাস করার কোন প্রশ্নই উঠে না। আজই তার মেয়ের বিয়ে। সন্ধ্যাবেলা বরযাত্রী আসবে। তাদের দুটা ডালভাত খাওয়াতে হবে। কিন্তু সেই পয়সা এখনো যোগাড় হয়নি। রিকশার জমার টাকা উঠতে এখনো বাকি। ইত্যাদি ইত্যাদি।

যত ফালতু কথা। তবু ইসহাক সাহেব তাকে একটা চকচকে দশ টাকার নোট দিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করলেন এখন থেকে যারা কম ভাড়ায় যেতে চায় তাদের রিকশায় উঠবেন না।

এই ব্যাটাও কম ভাড়ায় যেতে রাজি হয়েছে। এর কারণটা কি? ইসহাক সাহেব মনে মনে এর গল্পের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন। গল্পটা শুরু হবে কখন? কিন্তু শুরু হচ্ছে না। রিকশাওয়ালা মাথা নিচু করে তার মাথার বাবড়ি চুল হাওয়ায় উড়িয়ে একমনে চালাচ্ছে। লোকটা হয়ত খারাপ নয়। ইসহাক সাহেব বললেন, এই তোমার নাম কি? রিকশাওয়ালা মাথা ঘুরাল।

: আমারে কন?

: হ্যাঁ। কি নাম?

: ইসহাক।

বলে কি এ? এর নামও ইসহাক? ইসহাক সাহেবের অস্বস্তি লাগতে লাগল। যদিও অস্বস্তি বোধ করার কোনই কারণ নেই।

মুসলমানদের নামের সংখ্যা অল্প। অল্প কিছু নামই ঘুরে ফিরে আসে। একবার এক বাড়িতে দাওয়াত খেতে গিয়ে দেখেন বাবুর্চির নাম ইসহাক। এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে সেই ইসহাকের সঙ্গে তাঁর চেহারারও খানিকটা মিল ছিল। বড়ই অস্বস্তির ব্যাপার। অবশ্যি এই রিকশাওয়ালার সঙ্গে আর কোন মিল নেই।

: বাড়ি কোথায় তোমার ?

: আমারে কন ?

: হ্যাঁ। কোথায় তোমার বাড়ি ?

: বাড়ি ঘর কিছু নাই। বাড়ি ঘর থাকলে কি রিকশা চালাই ?

: ঘুমাও কোথায় ? রিকশার উপর তো নিশ্চয়ই ঘুমাও না ?

রিকশাওয়ালা জবাব দিল না। পিচ করে থুথু ফেলল। এই ব্যাটার থুথু ফেলার রোগ আছে। অসম্ভব রোদ। ব্যাটার রিকশা টানতে কষ্ট হচ্ছে। ইসহাক সাহেবের অস্বস্তি লাগতে লাগল। অস্বস্তির কারণ কি দুজনের একই নাম ? নামের প্রতি আমাদের কি অন্য এক ধরনের মমতা আছে ? হয়তবা।

: তোমার ছেলেপুলে আছে নাকি ইসহাক মিয়া ?

: আছে।

: কয়জন ?

: দুই মাইয়া।

কি সর্বনাশ, বলে কি এই লোক ? তারও দুই মেয়ে—লোপা এবং ইন্দ্রানী। তিনি দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—এদের নাম কি ?

: নাম দিয়া কি করবেন ?

: আহ বল না।

: একজনের নাম হইল গিয়া···

বলতে বলতে সে রাস্তার পাশে হঠাৎ রিকশা দাঁড় করিয়ে দিল। প্রায় টলতে টলতে নেমে পড়ল রিকশা থেকে।

: এ্যাই কি হয়েছে ?

: শইলটা খারাপ। পেটে ব্য থা।

নতুন ধরনের কোন চাল কি ? শরীর খারাপের অজুহাতে বাড়তি কিছু লাভের চেষ্টা ? হয়ত এই রোদে তার আর যেতে ইচ্ছা হচ্ছে না। ইসহাক সাহেবকে এখানেই নেমে যেতে হবে এবং পুরো পাঁচ টাকাই দিতে হবে। বিচিত্র কিছু না। এরা হাড়ে হাড়ে বজ্জাত।

ইসহাক সাহেব একটা সিগারেট ধরিয়ে আড় চোখে রিকশা-ওয়ালার দিকে লক্ষ্য রাখতে লাগলেন। শরীর খারাপের কতটা ভান এটা ধরতে চান। তিনি দেখলেন সে ফুটপাতে শুয়ে পড়েছে। দুহাতে খামচি দিয়ে তার পেট ধরে রেখেছে। কোন রকম শব্দ বা চিৎকার করছে না। কাজেই সম্ভবত ভান নয়। ভান হলে উহ আহা করে লোক জমিয়ে ফেলত। এখানে কোন লোকজন জমছে না। পাঁচ ছ' বছর বয়সের একটি টোকাই শ্রেণীর বালিকা কৌতূহলী চোখে দেখছে। বালিকাটির মুখ হাসি হাসি, যেন সে খুব মজা পাচ্ছে।

ইসহাক সাহেব রিকশা থেকে নামলেন। কি যন্ত্রণায় পড়া গেল। পাঁচটা টাকা তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে চলে যাবেন না কি ? এ রকম হৃদয়হীন কোন কাজ করা সম্ভব নয়।

: তোমার অসুবিধাটা কি ?

: পেটে ব্যথা।

: এ রকম আগেও হয়েছে ?

: জ্বি, হইছে।

এ রকম অসুখ নিয়ে রিকশা চালাও কেন ? পাগল নাকি ?

রিকশাওয়ালা লাল চোখে তাকাল। চোখ দুটি এখন লাল হয়েছে না আগেই লাল ছিল তিনি লক্ষ্য করেননি।

: সাব, আপনে আমার রিকশাটা দেখবেন। গরীব মানুষ রিকশা গেলে সব্বনাশ।

: রিকশা যাবে কেন ?

: সাব একটু দেখবেন। রিকশাটা দেখবেন সাব। আপনার পায়ে ধরি।

বলতে বলতে সত্যি সত্যি তার পায়ে ধরবার জন্যে রিকশাওয়ালা এগিয়ে আসতে চেষ্টা করল। তিনি চমকে পেছনে সরে গেলেন। ঠিক তখন লোকটি এক গাদা রক্ত বমি করল। ভয়াবহ ব্যাপার। ইসহাক সাহেব কপালের ঘাম মুছে কাঁপা গলায় ডাকলেন—এ্যাই এ্যাই। এ্যাই ইসহাক মিয়া।

: সাব আমার রিকশা। আমার রিকশা।

দেখতে দেখতে চারদিকে ভীড় জমল। মানুষের হৃদয় থেকে মমতা বোধহয় পুরোপুরি নিঃশেষিত হয়নি। দুটি যুবক ছেলে তাকে ধরাধরি করে বেবীটেক্সীতে তুলল। নিয়ে যাবে পিজিতে। তার রিকশার দায়িত্ব নিতে অনেককেই আগ্রহী দেখা গেল। ইসহাক সাহেব কাউকে সে দায়িত্ব দিতে রাজি হলেন না। জুন মাসের প্রচণ্ড রোদে নিজেই রিকশা টেনে টেনে নিয়ে গেলেন সায়েন্স ল্যাবোরেটরীর পুলিশ ফাঁড়িতে। এমন বিপদেও মানুষ পড়ে? রিকশা জমা দিয়ে যে বাসায় চলে যাবেন সে উপায় নেই। যেতে হবে পিজিতে। ইসহাক মিয়াকে বলতে হবে—রিকশা জায়গামত আছে। সে সুস্থ হয়ে ফিরে এলে তার রিকশা ফেরত পাবে। অথচ আজ তাঁর সকাল সকাল বাসায় ফেরা দরকার। ইন্দ্রানীর দাঁত ব্যথা। ছ'টার সময় তাকে ডেনটিস্টের কাছে নিতে হবে।

মানুষ হয়ে জন্মানোর অনেক যন্ত্রণা। ইসহাক সাহেব পুলিশ ফাঁড়ি পর্যন্ত যেতেই ঘেমে নেয়ে উঠলেন। তাঁর বড় বড় নিঃশ্বাস পড়তে লাগল। খালি রিকশা এত ভারী হয় তাঁর ধারণা ছিল না। কৌতূহলী লোকজন দু'পাশ থেকে তাঁকে দেখছে। ঢাকা শহরের মানুষের কৌতূহলের শেষ নেই। একটা গর্ত খুড়ে রাখলেও তার চারদিকে ভীড় জমে যায়। কর্মহীন লোকজন গভীর আগ্রহে গর্তের দিকে তাকিয়ে থাকে। যেন এই মুহূর্তে গর্তের ভেতর থেকে অদ্ভুত কোন জন্তু লাফিয়ে বের হবে। ইসহাক সাহেবের পানির পিপাসা পেয়ে গেল। বুক খা খা করতে লাগল। আহ কি যন্ত্রণা। পরিচিত কেউ না দেখলে বাঁচা যায়। চেনা জানা কারো সঙ্গে দেখা হলে

খুব কম করে হলেও এক লক্ষ প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। অফিসের নিজামুদ্দিনের সঙ্গে যদি দেখা হয় সে নির্ঘাৎ বলবে—আপনি অফ টাইমে রিকশা চালান তাতো জানতাম না। হা হা হা এখান থেকে আজিমপুর যেতে কত নেবেন? নিজামুদ্দিনের স্বভাবই হচ্ছে বদ রসিকতা করা। ছোটলোক কোথাকার! ইসহাক সাহেব 'পিচ' করে থুথু ফেললেন এবং দারুণ চমকে উঠলেন। তিনিও রিকশাওয়ালার মত থুথু ফেলতে শুরু করেছেন। কি সর্বনাশের কথা।

পিজিতে ইসহাক মিয়াকে খুঁজে বের করতে দেরী হল না। ইমার্জেন্সিতে একটি বেঞ্চের উপর তাকে শুইয়ে রাখা হয়েছে। মাথার উপর একটা ফ্যান। ফ্যান প্রবল বেগে ঘুরছে এবং বাতাসে ইসহাক মিয়ার লম্বা চুল উড়ছে। দীর্ঘ সময় তিনি তার পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর গেলেন অল্প বয়েসী এক ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার ছেলেটি ক্লান্ত এবং কোন কিছু নিয়ে খুবই চিন্তিত। তার বিরক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে ইচ্ছে করে না তবু তিনি বললেন—ঐ রিকশাওয়ালা কখন মারা গেছে?

ডাক্তার ছেলেটি ঠাণ্ডা গলায় বলল—জানি না কখন।

: ওর রিকশাটি আমি থানায় জমা দিয়েছি এখন কি করব? কাকে খবর দেব?

: আমাকে এই সব বলছেন কেন?

তিনি বারান্দায় সরে আসলেন। মিনিট দশেক দাঁড়িয়ে রইলেন একা একা। রোদ মরে আসছে। আকাশে মেঘ। তিনি হাসপাতাল থেকে বের হয়ে ঠাণ্ডা এক বোতল পেপসি খেলেন। ছ'টা বাজতে দেরী নেই ইন্দ্রানীকে ডেনটিস্টের কাছে নিতে হবে। তিনি একটা রিকশায় উঠে পড়লেন।

এই রিকশাওয়ালাটির বয়স খুবই কম। উৎসাহ বেশী। সে রিকশা নিয়ে ছুটছে। অকারণে বেল বাজাচ্ছে। খুব কায়দা করে সে দুটি রিকশা অভারটেক করে দাঁত বের করে হাসল। ইসহাক সাহেব মৃদুস্বরে বললেন—নাম কি তোমার?

: সামসু।

ইসহাক সাহেব কোমল স্বরে বললেন—তুমি কেমন আছ সামসু?

সামসু অবাক হয়ে পেছনে তাকাল। কোন জবাব না দিয়ে দ্রুত প্যাডেল চাপতে লাগল। সামনেই ট্রাফিক সিগন্যাল। অনেক ক্ষণ সবুজ বাতি জ্বলছে। ওটি লাল হবার আগেই তাকে পার হয়ে যেতে হবে। যাত্রীদের আজে বাজে প্রশ্নের জবাব দেবার তার সময় নেই।